আধ ডজন স্কুল

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

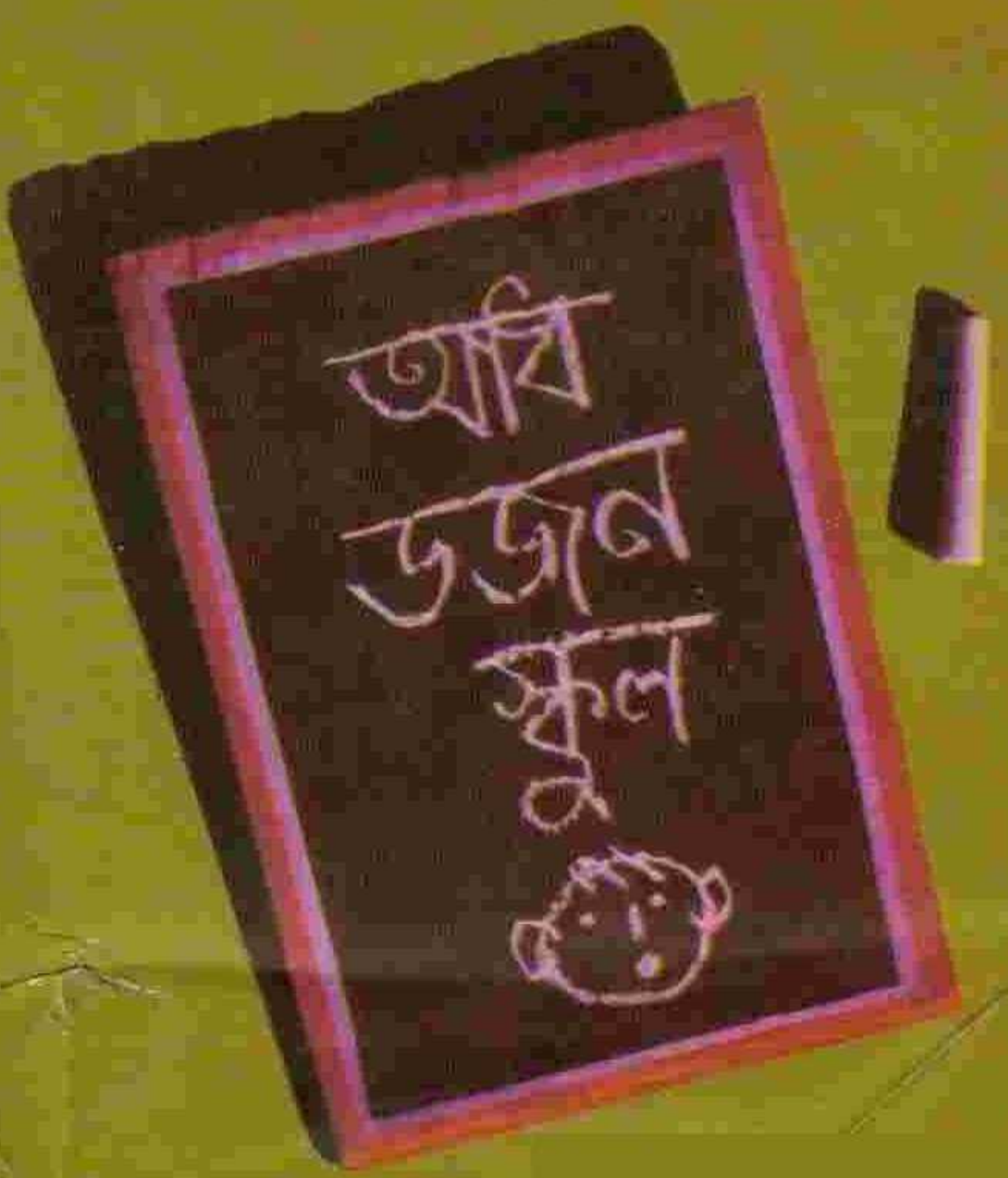

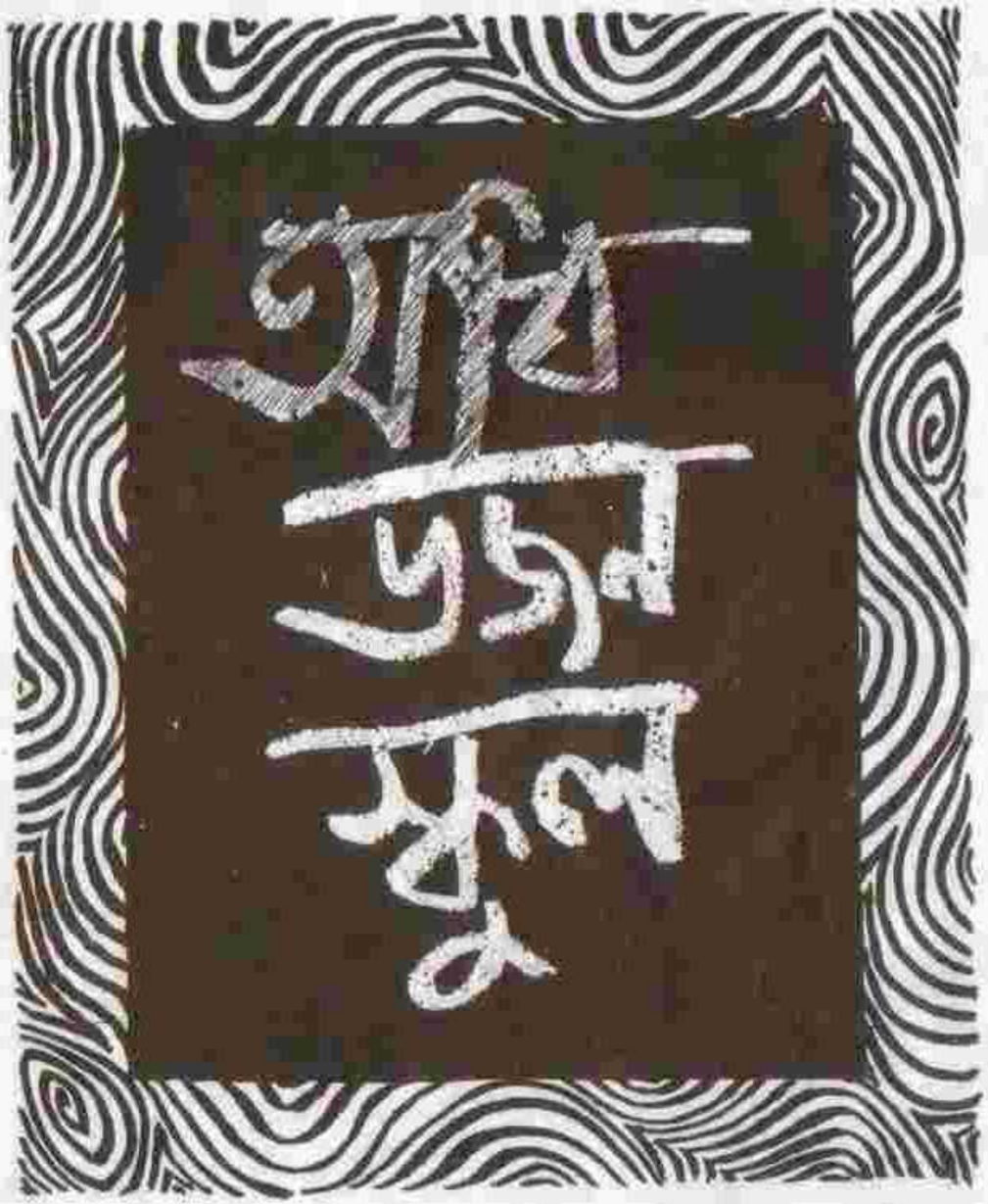

আধ ডজন স্কুল

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

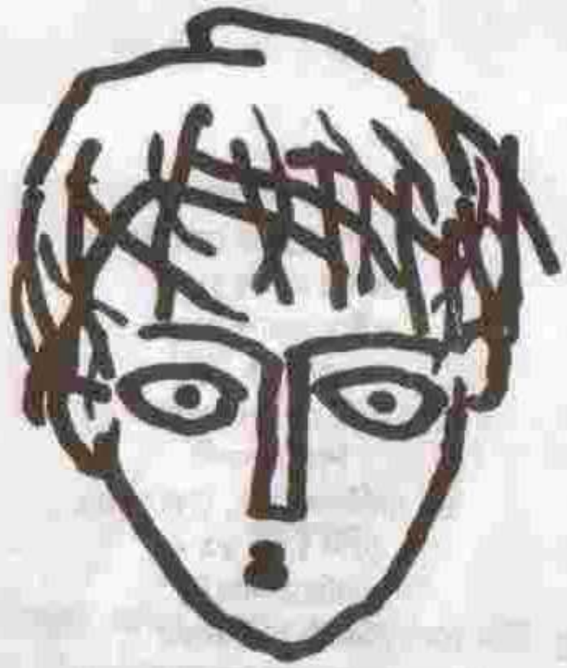

শিখা প্রকাশনী

স্বত্ব ঃ লেখক
প্রকাশ কাল ❑ বই মেলা ১৯৯৬
দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৭
তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯৯
প্রকাশক ❑
কাজী মোঃ শাহজাহান
শিখা প্রকাশনী
৬৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫২ ৫৯
পরিবেশনায় ❑
নিউ শিখা প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা।
প্রচ্ছদ ❑
ধ্রুব এষ
বর্ণ বিন্যাস ❑
রূপালী কম্পিউটার্স
তাজমহল মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা।
মুদ্রণ ❑
সালমানী মুদ্রণ
নয়াবাজার, ঢাকা
দাম ❑
পঞ্চান্ন টাকা মাত্র।

ভূমিকা

এটি আমার স্কুল জীবনের স্মৃতি। কেউ যদি মনে করে এটি পূর্নাঙ্গ স্মৃতি সে খুব ভুল করবে, এখানে কোন দিন-তারিখ নেই, কোন নাম পরিচয় নেই। আমার স্মৃতি খুব দুর্বল। শুধু যে দুর্বল তাই নয় পক্ষপাত দুষ্ট। অনেক তুচ্ছ কথা মনে রেখে বড় বড় কথা পুরোপুরি ভুলে গেছে।

সবকিছুর একটা কারণ থাকে। আমার মস্তিষ্ক যে সব বড় বড় জিনিষগুলি ফেলে দিয়ে তুচ্ছ কথাগুলিকে তার নিউরনের মাঝে সাজিয়ে রেখেছে তারও নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। কে জানে, হয়তো এই তুচ্ছ জিনিষগুলি আমার জন্যে তুচ্ছ নয়, হয়তো এটাই আমার সবকিছু।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
পল্লবী, ঢাকা
৮ই অক্টোবর, ১৯৯৫

শিখা প্রকাশনী হতে
প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

- ত্রিনিত্রি রাশিমালা
- দুষ্টু ছেলের দল
- দীপু নাম্বার টু
- ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম

হাতীর মাথা

ছোট থাকতে আমি একটু বোকা গোছের ছিলাম। আমাকে যারা চেনে তাদের অনেকেই মাথা নেড়ে বলবে, "তুমি এখনও এমন কিছু চালাক চতুর হয়ে যাও নি!" কথাটা হয়তো পুরোপুরি মিথ্যা না, কিছু কিছু বিষয়ে এখনো আমি হাবা গোবা। তবে ছোট থাকতে আমি কিছু কিছু বিষয়ে নয় একেবারে সব বিষয়ে হাবাগোবা ছিলাম। আমাকে এক নজর দেখলেই চোখের পলকে সবাই সেটা ধরে ফেলত।

আমি যখন ছোট ছিলাম পুরো পৃথিবীটা মনে হত অসম্ভব জটিল। এই জটিল পৃথিবীর নানা কাজকর্ম কেন এভাবে এভাবে চলছে ভেবে আমি কোন কূল কিনারা পেতাম না। কখন কি করতে হবে বা কখন কি বলতে হবে আমি কিছুতেই ঠিক করতে পারতাম না। তাই কথাবার্তা বলতাম খুব কম কাজ কর্ম করতাম আরো কম। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত যখন কিছু একটা করতাম প্রায় সব সময় দেখা যেতো কাজটা ভুল। যেমন ধরা যাক আমার বড় মামার ব্যাপারটা।

আমরা যখন সিলেট থাকতাম আমাদের বড় মামা তখন মাঝে মাঝে আমাদের সাথে থাকতেন। বড় মামার নানারকম গুণ ছিল। মামা সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে টেবিলে এক ধরনের বল তৈরী করতে পারতেন। সেটা ফাটিয়ে দিলে ভিতর থেকে আগ্নেয়গিরির মত ধোঁয়া বের হয়ে আসত। খেতে বসে আমাদের খেতে ইচ্ছে না করলে মামা ডাল ভাত মাখিয়ে প্লেটে এক ধরনের কোল বালিশ তৈরী করে দিতেন এবং সেই বালিশটা খেয়ে ফেলা অনেক সহজ ছিল। তা ছাড়াও বড় মামা তিনটি ছবি আকঁতে পারতেন, একজন মানুষ টিউবওয়েল চেপে পানি বের করছে, একটা প্লেন আকাশে উড়ছে এবং একটা পাখী ডানা ছড়িয়ে দাড়িয়ে আছে। বড় মামা যখন তার ঐ তিনটি ছবির কোন একটি আকঁতেন আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে মামার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মাঝে মাঝে মামা আমাদের পাখীর পালক, প্লেনের যাত্রী বা টিউবওয়েলের পানির ফোটা আকঁতে দিতেন এবং সেটা করতে পেরে গর্বে আমাদের বুক দশ হাত ফুলে যেতো।

আমি প্রাণপণে বড় মামার সব কাজকর্ম অনুকরণ করার চেষ্টা করতাম কিন্তু সেই কাজটা খুব সহজ ছিল না। বড় মামা সিগারেট খেতে পারেন, সাইকেল

চালাতে পারেন, " ম্যায় আওয়ারা হুঁ..." গান গাইতে পারেন- আমি তিন চার বছরের একটা বাচ্চা সেগুলি করব কী করে? কিন্তু একদিন হঠাৎ মামার একটা কাজ অনুকরণ করার সুযোগ এসে গেল।

আমাদের বাসার সীমানার মাঝে একটা কুয়া ছিল, গভীর কুয়া- চওড়া দেয়ালের রেলিং দিয়ে ঘেরা। একদিন বিকাল বেলা দেখা গেল বড় মামা সেই কুয়ার রেলিংয়ে বাঁকা হয়ে শুয়ে বই পড়ছেন। গভীর কুয়ার নিচে কালো পানি চিক চিক করছে। তার রেলিংয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে বুকের পাটা লাগে। একটু গড়িয়ে গেলেই ঝপাং করে কুয়ার ভিতরে পড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাবার কথা। এরকম একটা সাহসের কাজ যে আমাদের বড় মামা ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ করতে পারবে না সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। আমরা ভাই বোনেরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের সেই অসীম সাহসী বীর বড় মামার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এর পর থেকেই আমি কুয়ার আশে পাশে ঘুর ঘুর করি। একদিন যখন দেখলাম আমার আশে পাশে কেউ নেই খুব সাহস করে হাচঁড়ে পাচঁড়ে কুয়ার রেলিংটার মাঝে উঠে গেলাম। গভীর কুয়ার নিচে কাল পানি দেখে ভয়ে আমার পেটের ভিতরে পাক দিয়ে উঠছে-একটু অসাবধান হলেই তাল হারিয়ে নিচে পড়ে অন্ধকারে হারিয়ে যাব তবুও আমি খুব সাহস করে কুয়ার রেলিংয়ে বাঁকা হয়ে শুয়ে পড়লাম। তখনো আমার অক্ষর পরিচয় হয় নি তাই পড়ার জন্যে বড় মামার মতো একটা বই নিয়ে আসা গেল না।

আমি কুয়ার রেলিংয়ে শুয়ে আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে আছি। বুকের ভিতরে একই সাথে ভয়ের কাপুনী আর খুব বড় একটা কিছু করে ফেলার আনন্দ। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে এবং শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় চোখে একটু ঘুম ঘুম নেমে এসেছে হঠাৎ চিলের মত গলায় কে যেন চিৎকার করে উঠল। মাথা ঘুরিয়ে দেখি আমার বড় বোন। আমার এত বড় একটা কাজ দেখে সে মুগ্ধ না হয়ে ভয় পেল কেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তার চিৎকারে কাজ হল, বাসার ভিতরে যারা ছিল সবাই ছুটে বের হয়ে এল।

বড়দের মাঝে কয়েকজন আমাকে ভড়কে না দিয়ে খুব শান্ত ভাবে কথা বলে ধীরে ধীরে কাছে এসে আমাকে জাপটে ধরে ফেলে সাবধানে নামিয়ে নিয়ে এল। অন্য যে কেউ হলে তাকে ধরে মনে হয় শক্ত মার লাগানো হত, কিন্তু আমাকে কেউ কিছু বলল না, ব্যাপারটা দুষ্টুমি নয়। দুষ্টুমি করার জন্যে যেটুকু বুদ্ধি দরকার আমার সেটুকু বুদ্ধি নেই!

এই কুয়া নিয়ে আরো গল্প আছে। কুয়োর পানি খুব পরিষ্কার ঝকমকে, বাসার সব কাজে এটা ব্যবহার করা হয়। একদিন হঠাৎ দেখা গেল পানিতে বোটকা এক রকমের গন্ধ, কোন কারণে পানিটা নষ্ট হয়ে গেছে। বড় মামা একই সাথে আমাদের বাসার ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এবং সায়েন্টিস্ট। পানি পরীক্ষা

করে বললেন "এই কুয়োর ভিতরে কিছু একটা পড়েছে। সব পানি সেঁচে তুলে কুয়ো পরিষ্কার করতে হবে।"

দেখতে দেখতে কাজ শুরু হয়ে গেল। আরো কয়েকটা দড়ি-বালতি জোগাড় করে বড় মামার সাথে আরো কয়েকজন মিলে পানি সেঁচে তুলতে শুরু করল। বিশাল হৈ চৈ ব্যাপার, ঝপাং করে কুয়োর মাঝে বালতি ফেলা হচ্ছে, দুদ্দাড় করে সেই বালতি টেনে তোলা হচ্ছে; হুশ করে সেই পানি কুয়োতলায় ঢেলে দেয়া হচ্ছে। এক সাথে কয়েকজন হাত লাগিয়েছে, দেখতে দেখতে কুয়া খালি হয়ে গেল। তখন আমাদের দুঃসাহসিক মামা একটা দড়ি বেয়ে সেই কুয়ার ভিতরে নেমে গেলেন। আমার বড় দুই ভাই বোন স্কুলে গেছে। যারা আমার ছোট তারা ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝার জন্যে বেশী ছোট! কাজেই আমি একা এত বড় একটা ব্যাপার চোখের সামনে ঘটতে দেখছি, উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা।

কুয়োর ভিতরে পানি নষ্ট করার অপরাধি একটা পচা মাছ পাওয়া গেল। শুধু তাই না, দীর্ঘদিনে কুয়োর মাঝে পড়ে যাওয়া আরো অনেক জিনিষ আবিষ্কার হল। জং ধরা নাট বল্টু, সবুজ রংয়ের শিশি, রঙিন কাঁচ, নুড়ি পাথর, প্লাষ্টিকের চিরুনী, মাটির ভাঙ্গা পুতুল আরো কত কী! কত লক্ষ বছর থেকে না জানি এগুলি পানির নীচে আছে, উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বড় মামা কুয়ার ভিতর থেকে বের হয়ে এসে আমাকে সেইসব রহস্যময় জিনিসগুলি দিয়ে দিলেন, আমি নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারি না।

দুপুরে আমার বড় ভাই বোন দুজন স্কুল থেকে এসেছে। আমি কথা বলি কম, বেশী বলতে গেলে তোতলামো এসে যায়; তবু তার মাঝে আমি বড় বড় করে বললাম, "বল দেখি আজকে কি বড় মামা কুয়োর সব পানি সেঁচে ফেলেছেন কী না?

আমার বড় ভাই বোন দুইজন একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ"

তারা আজকে বাসায় ছিল না তবু ব্যাপারটা কী ভাবে জেনে গেল ভেবে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম আবার জিজ্ঞেস করলাম, "বল দেখি সব পানি সেঁচে ফেলে বড় মামা দড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছিলেন কী না?"

তারা দুইজন আবার মাথা নাড়ল, "গিয়েছিলেন।"

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম, কেমন করে সবকিছু বলে দিচ্ছে? এবারে আমি আরো কঠিন প্রশ্ন করলাম, হাতের জং ধরা নাট বল্টু রঙিন কাঁচ মাটির পুতুল দেখিয়ে বললাম, "বল দেখি এইগুলি মামা কুয়োর ভিতর থেকে বের করে এনেছেন কী না?"

আমার বড় ভাই বোন দুইজন ফিক করে হেসে ফেলে বলল, "হ্যাঁ এনেছেন।"

আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম। পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে তাদের অজান্তে, দেখেছি শুধুমাত্র আমি, তবুও কেমন করে সবকিছু জেনে গেছে? কেমন করে এটা সম্ভব? আমার বড় ভাই বোনের বুদ্ধি দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

আমি যে বাড়াবাড়ি বোকা ছিলাম তার এরকম আরো অনেক প্রমাণ আছে– যেমন আমার সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল চিঠি পোস্ট করা। যেহেতু এই কাজটা আমার খুব প্রিয় তাই বাসায় কখনো চিঠি লেখা হলেই সেটা আমাকে পোষ্ট করতে দেয়া হত। আমি সেই চিঠি হাতে নিয়ে গুটি গুটি হেঁটে যেতাম, ছোট রাস্তা পার হয়ে বড় রাস্তায়। বড় রাস্তার দোকানপাট পার হয়ে একটা বড় দোকান, তার কাছে একটা লাইটপোস্ট। সেই লাইট-পোস্টের নিচে চিঠি ফেলার ডাকবাক্স। চিঠির ডাকবাক্সের কাছে এসেই আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করত, কারণ আমার এই যে প্রিয় কাজ চিটি পোস্ট করা, ডাক বাক্সের নিচে এসে আমার মনে পড়ত যে আমি কাজটা করতে পারি না। আমি তখন সাইজে এত ছোট যে আমার হাত ডাক বাক্সের ফুটো পর্যন্ত যায় না। কাউকে যে বলব চিঠিটা পোস্ট করে দিতে আমার সেরকম সাহস নেই।

কাজেই আমি বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে চিঠি পোস্ট করার দুঃসাহসিক কাজটা শুধু করে দিতাম। প্রথমে চেষ্টা করতাম পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে লম্বা হয়ে চিঠি ফেলার, সেটা খুব ভাল কাজ করত না তখন চেষ্টা করতাম ডাক বাক্সটা বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে যাওয়ায়, খিমচে খিমচে খানিকটা উঠে সব সময়েই পিছলে নেমে আসতাম। তখন চেষ্টা করতাম দূর থেকে ছুটে এসে লাফ দিয়ে খানিকটা উপরে উঠে চিঠিটা ছুঁড়ে ভিতেরে ফেলে দেয়ার– আমার সেই লাফ ঝাঁপ খুব দর্শনীয় ছিল এবং কিছুক্ষণ পার হবার পর সব সময়েই কেউ না কেউ সেটা দেখতে পেত এবং সে আমার চিঠিটা পোস্ট করে দিত।।

আমি যদিও খুব ছোট থাকতে আবিষ্কার করেছিলাম আমি একটু হাবাগোবা গেছের সেটা নিয়ে আমার মনে কোন দুঃখ ছিল না। আমার বড় দুই ভাই বোন খুব চালাক চতুর সেটা জেনেই আমি খুব খুশী ছিলাম। আমি সব সময় তাদের পিছু পিছু ঘুর ঘুর করতাম। বড় ভাই সেই বয়সে মাঝে মাঝে রেষ্টুরেন্টে চা কিনে খেতো সেই গল্প শুনেই আমার রোমাঞ্চ হত। বড় দুজন তখন স্কুলে যেতে শুরু করেছে। সন্ধ্যেবেলা তারা পড়তে বসে আমিও সাথে সাথে বসি। পড়া জিনিষটা তখন আমার কাছে একটা রহস্যের মত, তারা যখন সুর করে কিছু একটা পড়ে আমি মুখ হা করে বসে তাদের দেখি। কাগজের মাঝে কালো হিবিবিজি লেখা তার মাঝে সব কথা লুকানো রয়েছে তারা দেখেই সেটা বুঝে ফেলতে পারে। পড়ার থেকেও বড় রহস্য হচ্ছে লেখা। রুল টানা খাতায় গোটা

গোটা করে তারা হাতের লেখা লিখতে থাকে। কি বিচিত্র সেই লেখা, দেখে আমি কিছুই বুঝতে পারি না কিন্তু তার মাঝে কথা লুকানো রয়েছে।

যখন আশে পাশে কেউ থাকে না তখন খুব মনোযোগে দিয়ে তাদের হাতের লেখাগুলি দেখি। দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেললাম, লেখার মাঝে বেশ কিছু ছবি লুকানো রয়েছে। যে ছবিটা সবচেয়ে পরিষ্কার সেটা হচ্ছে একটা হাঁতীর মাথা। আমি তখনো পড়াশোনা শিখি নি বলে বুঝতে পারিনি যে হাতীর মাথাটা আসলে এই ইকারের উপরের অংশটা, আমার ভাই বোন দুজনেই সেটা লিখত খুব কায়দা করে, মনে হত হাঁতীর শুড়। হাতের লেখার মাঝে একটু পরে পরেই সেই হাতীয় মাথা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। হাতীর মাথাগুলি দেখে কিছুক্ষণের মাঝেই আমি আরো একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম, ছবিগুলি অস্পূর্ণ– কোনটাতেই হাঁতীর চোখ গুলি আঁকা হয় নি। আমার ভাই বোন সময়ের অভাবে বা আলসেমী করে যে হাঁতীর মাথায় চোখ গুলি আঁকে নি সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না– তাদের সাহায্য করার জন্যে তখন তখনিই আমি একটা কলম নিয়ে তাদের হাতের লেখার খাতায় সবগুলি হাঁতীর মাথার খুব যত্ন করে চোখ এঁকে দিলাম। দেখতে দেখতে নিরীহ হাতের লেখার খাতাগুলিতে একটা জীবন্ত ভাব ফুটে উঠল, অর্থহীন আঁকি ঝুকির মাঝে হাতীর মাথাগুলি ড্যাব ড্যাব করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের হাতের কাজ দেখে গর্বে আমার বুক দশ হাত ফুলে উঠল।

স্কুলে স্যারদেরকে সেই হাতের লেখার খাতা দেওয়ার পর কি ঘটেছিল আমি নিজের চোখে দেখি নি। খুব ভাল কিছু হয়েছিল সেরকম মনে হয় না; কারণ বাসায় এসেই দুইজনেই হৈ হৈ করে প্রায় আমার ওপরে চড়াও হয় হয় অবস্থা। অন্য কেউ হলে তার বারটা বেজে যেতো সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু আমি বলে ছেড়ে দিল। কাজটি যে আমি দুষ্টুমী করে করি নি সরল বিশ্বাসে করেছি সেটা নিয়ে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না। ঘটনার প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর চোখ আকার জন্যে দুইজনই তাদের পুরানো হাতের লেখার খাতাগুলি আমাকে দিয়ে দিল।

তখন কি যে আনন্দ হল আমার সে আর বলার মত নয়, যতগুলি হাঁতীর মাথা ছিল সবগুলিতে একটা করে ড্যাব ড্যাবে চোখ এঁকে দেয়া যে কি আনন্দ সেটা যারা করেছে শুধু তারাই বুঝতে পারবে।

প্রথম শিক্ষক

পৃথিবীর প্রয়োজনীয় জ্ঞানের আমার প্রথম শিক্ষক ছিল রফিক। রফিক ছিল আমাদের বাসার কাজের ছেলেটি, তার গায়ের রং ছিল কুচকুচে কাল। রফিককে দেখে ছেলেবেলায় আমি ধরে নিয়েছিলাম যে যাদের গায়ের রং হবে কুচকুচে কাল শুধু তাদেরই নাম হবে রফিক–তাই যখন একজন রফিককে পেয়েছিলাম যার গায়ের রং কাল নয় আমি এত অবাক হয়েছিলাম সেটি বলার নয়।

রফিক আমাদের নানা ধরণের জ্ঞান দান করত। তার প্রথম জ্ঞান ছিল মাকড়শা নিয়ে, সে আমাদের শিখিয়েছিল যে মাকড়শার পেটের ভিতরে সুতা থাকে এবং যথেষ্ট ধৈর্য্য থাকলে সেই সুতা টেনে বের কর নেয়া যায়। তার কথা যে সত্যি সেটা প্রমাণ করার জন্যে সে বাসার পিছনের কাঠাল গাছ থেকে বড় বড় মাকড়শা ধরে আনত। এই এলাকায় এক রকম মাকড়শা দেখা যায় যেগুলি আটটি পা কে দুটি দুটি করে চার ভাগ করে ইংরজী এক্স অক্ষরের মত করে জালের মাঝে বসে থাকে। শুধু তাই না মাকড়শার পিঠের নক্সা দেখে মনে হয় বড় বড় দুটি চোখে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। এই মাকড়শাগুলি ভাল খেয়ে দেয়ে বিশাল আকার নিয়ে নিত– তবে রফিকের অত্যাচারে তাদের জীবন মোটামুটি ভাবে দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যারা মাকড়শার পেট থেকে সুতা বের করার চেষ্টা করেছে (আমার কেন জানি মনে হয় সেরকম মানুষের সংখ্যা খুব বেশী নেই) তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে কাজটা খুব সহজ নয়। মাকড়শাগুলি কাজটা পছন্দ করে না এবং আটটি পায়ের সবগুলি ব্যবহার করে প্রাণপণে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তখন মাকড়শাটিকে খুব কায়দা করে ধরে রাখতে হয় এবং পেছনের কোন একটা সূক্ষ্ম ফুটো থেকে সুতোর প্রথম অংশটা বের করে নিতে হয়। একবার সেটা পেয়ে গেলে পরের অংশটা সহজ, টেনে টেনে সুতোটা বের করে হাতের আংগুলে পেঁচিয়ে নেওয়া। রফিকের বক্তব্য অনুযায়ী মাকড়শার পেটে এক রকম সুতার গুটি থাকে এবং বাইরে থেকে সুতা টানতে থাকলে ভিতরে গুটি ঘুরতে ঘুরতে সুতাটুকু বের হয়ে আসে। একটা মাকড়শার পেটের ভিতর থেকে সমস্ত সুতা বের করে আংগুলে পেঁচিয়ে নিয়ে রফিক মাকড়শাগুলিকে ছেড়ে দিত। সুতা বের করে নেওয়া ছাড়া রফিক কখনো কোন মাকড়শার অন্য কোন ক্ষতি করে নি–কারণ সে আমাদের বলেছিল মাকড়শা মারা হচ্ছে কবিরা গুনাহ। মাকড়শা না মারলেও তার ভিতর থেকে সুতোটুকু টেনে বের করে নেবার পর মাকড়শা গুলিকে খুব নিরুৎসাহিত দেখা যেতো। আমার ধারণা, পুরো ব্যাপারটাকে মাকড়শারা নিশ্চয়ই একটা বড় ধরনের অপমান হিসেবে বিবেচনা করত।

রফিক আমাদের দ্বিতীয় জ্ঞানটি দিয়েছিল রক্তচোষা নিয়ে। রক্তচোষা এক ধরনের ছোট পিরগিটি, গাছপালায় পাতার সাথে মিশে লুকিয়ে থাকে। রফিকের কাছে আমরা জেনেছিলাম মানুষের রক্ত চুষে খেয়ে ফেলতে পারে বলে এর নাম রক্তচোষা। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে মানুষের রক্ত চুষে খাবার জন্যে এটাকে কারো কাছেও আসার প্রয়োজন হয় না। দূর থেকে সেটা কারো দিকে তাকিয়েই তার রক্ত চুষে খেয়ে ফেলতে পারে। রফিকের কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, প্রথম যেদিন আমরা গাছের ডালে একটা রক্তচোষা দেখতে পেলাম সেটা আমাদের রক্ত খেয়ে কিছুক্ষণের মাঝেই তার গলাটা টকটকে লাল করে ফেলল। সব রক্ত খেয়ে ফেলছিল বলে আমাদের দুর্বল লাগতে থাকে এবং আমাদের হাঁটুতে কোন জোর ছিল না– মনে হচ্ছিল এই বুঝি আমরা হাঁটু ভেঙ্গে পরে যাব। সেই ভয়ংকর বিপদের মুখে রফিক এতটুকু না ঘাবড়িয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে আমাদের সবার প্রাণ রক্ষা করেছিল। সে চিৎকার করে সবাইকে বলল, "রক্ত খেয়ে ফেলছে, সাবধান! কেনে আঙুল মুখের মাঝে!"

আমি কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "কেনে আঙুল মুখে দিলে কি হয়?"

"মুখে দিয়ে কেনে আঙুল চুষতে থাকেন।"

"কি হবে চুষলে?"

"রক্তচোষা একদিক দিয়ে চুষবে, আপনি অন্যদিক দিয়ে চুষবেন। রক্ত তাহলে শরীর থেকে বের হতে পারবে না।"

জান বাঁচানোর এত বড় একটা পথ বাতলে দেওয়ায় রফিকের উপর আমাদের কৃতজ্ঞতার কোন শেষ ছিল না। সবাই নিজেদের কেনে আঙুল মুখে ঢুকিয়ে আঙুলটাকে চুষতে চুষতে সেটাকে প্রায় ছিবড়ের মত করে ফেললাম। রক্তচোষাকে তার কোন রক্ত চুষতে না দিয়ে উল্টো নিজেদের খানিকটা রক্ত চুষে শরীরে ফেরৎ নিয়ে, কোন মতে আমরা প্রাণ নিয়ে বাসায় ফিরে এসেছিলাম।

প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের নানারকম জ্ঞান দান করলেও যে বিষয়ে রফিক আমার জীবনে বিশেষ অবদান রাখার চেষ্টা করেছিল হচ্ছে সাহিত্য। ব্যাপারটা মনে হয় আরেকটু খুলে বলা দরকার।

আমরা ভাইবোনেরা যখনই মুখ ফুটে কথা বলতে শুরু করেছি ঠিক তখন আমাদের বাবা আমাদের সবাইকে একটা করে কবিতা শিখিয়েছিলেন। কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ নামক একজন মানুষের কবিতা। প্রথমে ধারণা ছিল মানুষটি আমাদের কোন একজন আত্মীয় কারণ বাইরের ঘরে মানুষটির ছবি টানোনো আছে। মানুষটা দেখতে আমার দাদার মত– মুখে লম্বা দাড়ি গায়ে লম্বা আলখাল্লা এবং আমার দাদার মতই লম্বা। পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছি মানুষটি আমাদের আত্মীয় নন তিনি একজন কবি।

আমার বাবা এই কবির লেখা 'প্রশ্ন' নামের যে কবিতাটি আমাকে শিখিয়েছিলেন তার প্রথম লাইনটি ছিল এরকম:

"ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠিয়েছ বার বার–"

আমি তখনো পড়তে শিখি নি কাজেই পুরো কবিতাটি আমাকে শিখতে হল মুখে মুখে। কবিতাটিতে অনেক শব্দ আছে যার অর্থ আমি জানি না নিজে নিজে ভেবে ভেবে আমি সেই সব শব্দের অর্থ বের করে নিলাম। যেরকম 'দূত' শব্দটি আমি তখনো জানি না কাজেই আমি ধরে নিলাম শব্দটি হবে 'দুধ'। 'ভগবান' শব্দটিও তখনো আমি জানি না কিন্তু যেহেতু দুধ পাঠাচ্ছে, মানুষটি যে একজন গোয়ালা সেটা ভেবে বের করতে আমার এতটুকু দেরী হল না

গোয়ালার দুধ দিয়ে যাওয়ার এই কবিতাটি কীভাবে হাত পা নেড়ে আবৃত্তি করতে হবে সেটা আমার বাবা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কেন মুখ গম্ভীর করে হাত পা নেড়ে এই কবিতাটা এভাবে বলতে হবে সেটা নিয়ে আমার মনে নানারকম প্রশ্ন ছিল কিন্তু ছোট অবস্থায় একটা জিনিস শিখেছি, সেটা হচ্ছে বেশীর ভাগ প্রশ্নেরই উত্তর নেই। কিংবা যদি উত্তর থাকে সেই উত্তরটা প্রশ্ন থেকেও কঠিন। কাজেই কোন সমস্যা হলে প্রশ্ন না করে ভেবে ভেবেই আমি উত্তরটা বের করে ফেলার চেষ্টা করি।

কবিতাটি শিখে নেবার পর আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম। যদিও কবিতাটার অর্থ ভাল করে বুঝি না তবুও যখন আশেপাশে কেউ থাকে না হাত পা নেড়ে সেটা আবৃত্তি করতে এক ধরণের রোমাঞ্চ হয়। আমি বাসার পিছনে কাঠাল গাছগুলিকে নিয়মিত ভাবে আমার কবিতা শুনিয়ে যেতাম। শ্রোতা হিসাবে কাঠাল গাছ থেকে ভাল আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।

কাঠাল গাছের সাথে শ্রোতা হিসেবে আমি একদিন রফিককে পেয়ে গেলাম। রফিক গম্ভীর হয়ে পুরো কবিতাটা শুনে মাথা নেড়ে বলল, "কবিতাটা মন্দ না, তবে কিছু সমস্যা আছে।"

"কি সমস্যা?"

"আপনার কবিতার মাঝে মিল নাই। সুর নাই। কোন কাহিনী নাই। বাজারে একজন কবিতা বিক্রি করে এক কবিতা এক আনা করে দাম, সেই কবিতা শুনলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।"

"তার কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকেও ভাল?"

রফিক তার কুচকুচে কাল মুখে ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হেসে বলল, "কী বলেন আপনি, কিসের সাথে কিসের তুলনা! আপনার কবিতা সেই কবিতার পায়ের নখের যুগ্যিও না!"

যে কবির বিশাল ছবি আমাদের বাসার দেওয়ালে টাংগানো আছে তার থেকেও বড় একজন কবির খোঁজ পেয়ে আমি রীতিমত চমকে উঠলাম। রফিক গলা নামিয়ে বলল, "আপনি যদি চান, আপনাকে নিয়ে যাব।"

"নিয়ে যাবে?"

"হ্যা। এক আনা করে কবিতার দাম, ইচ্ছা করলে কিনতেও পারেন।"

"কিন্তু–" আমি ইতস্তত: করে বললাম, "আমি তো পড়তে পারি না।"

রফিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমিও পারি না।" কিন্তু সে নিরুৎসাহিত হল না বলল, "আপনাকে নিয়ে যাব। পড়তে না পারলে কি হয়? শুনে আসবেন। এক নম্বুরী কবিতা। শুনতেও ভাল। আপনার বড়ীন্দ্রনাথ থেকে হাজার গুণ ভাল।"

"বড়ীন্দ্রনাথ না, রবীন্দ্রনাথ।"

"ওই একই কথা।"

রফিকের প্রচন্ড উৎসাহ সে আমাকে এক নম্বুরী কবিতা শোনাবে। একদিন বাজার করতে যাওয়ার সময় আমার মা'কে বলে সে সাথে আমাকে নিয়ে নিল। দীর্ঘ পথ আমি রফিকের হাতে ধরে গুটি গুটি যাচ্ছি। বাজারের কাছে এসে দেখা গেল এক জায়গার মানুষের ভীড়। সাথে সাথে রফিকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে, " ঐ যে কবিতা!"

সে ভীড় ঠেলে আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। আমাকে ঠেলে ঠুলে সামনে নিয়ে বসিয়ে দিল, মাঝখানে একজন মানুষ, চোখে চশমা। উশখু খুশকু চুল। পান খাওয়া লাল দাঁত,হাতে একটা নিউজপ্রিন্টের হ্যান্ডবিলের মত জিনিস ধরে সেটা দেখে দেখে উচ্চস্বরে কবিতা পড়ছে। ভাবের আবেগে তার মুখ থেকে থুতু ছিটে যাচ্ছে, চোখের তারা ঘুরে যাচ্ছে, গলার স্বর ওপরে উঠে যাচ্ছে আবার নিচে নেমে আসছে। সে হাত নাড়ছে, পা নাড়ছে, মাথা নাড়ছে। সুর করে কবিতা পড়তে পড়তে ঘুরে যাচ্ছে নেচে আসছে। তার গলার স্বরে কখনো রাগ, কখনো আনন্দ, কখনো যন্ত্রনা, কখনো চিৎকার আবার কখনো গলা নামিয়ে ফিস ফিস শব্দ। চারপাশে লোকজন মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে, রফিক আমার পিঠে খোচা দিয়ে বলল, "কি? বলেছিলাম না, এক নম্বুরী কবিতা?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"আপনার বড়ীন্দ্রনাথ কি এর ধারে কাছে আসবে?"

"বড়ীন্দ্রনাথ না রবীন্দ্রনাথ।"

"ঐ একই কথা। লাগে এর ধারে কাছে?"

আমি উপস্থিত কবি আর মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকদের দেখে রফিকের কথা প্রায় মেনেই নিচ্ছিলাম কিন্তু শেষ মুহূর্তে কি হল জানি না মত পরিবর্তন করে বললাম, "উহুঁ। রবীন্দ্রনাথই ভাল।"

রফিক অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। সাহিত্যের মূল্য বিচার সম্পর্কে সেটা ছিল আমার প্রথম বক্তব্য।

বেত

আমার প্রথম স্কুলের নাম কিশোরী মোহন পাঠশালা। আমার বড় ভাই বোন আগে থেকে সে স্কুলে যাচ্ছে এবং এক সময়ে আমাকেও সেখানে পাঠানো হয়। আমি একটু হাবাগোবা গোছের ছিলাম বলেই হয়তো সবাই ধরে নিল একা একা একটা ক্লাশে আমি নিজে নিজে কুলিয়ে উঠতে পারব না। আমাকে তাই দেওয়া হল আমার বড় বোনের সাথে। বড় বোন শেফু তার ছোট ভাইকে যক্ষের মত আগলে স্কুলে রওনা দিল। কোথায় বসব কেমন করে বসব, কি পড়ব, কি লিখব, কেমন করে লিখব কিছু জিজ্ঞেস করলে কি বলব সবকিছু সে বলে দিল। ঘরে বসে পড়াশোনা করে ততদিনে পড়তে শিখেছি ছোট খাটো অংকও করতে পারি কিন্তু স্কুলের বিভাষিকাময় ঘরে পা দেয়া মাত্র সবকিছু কেমন করে যেন গুলিয়ে যায়।

স্কুলটি মোটামুটি দীনহীন। বেঞ্চ খুব বেশী নেই, আগে না এলে বসার ভাল জায়গা পাওয়া যায় না। গরীব কিছু ছেলেমেয়েকে অবশ্যি সব সময়েই মেঝেতে বসতে হয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে তারা ক্লাশ করে, তারা যে বেঞ্চে বসতে পারে না সেটা নিয়ে নিজেদের খুব আপত্তি আছে বলে মনে হয় না।

আমি স্কুলে তটস্থ হয়ে থাকি। অন্য ছেলেরা ক্লাশের ফাঁকে হৈ চৈ করে ছুটোছুটি করে, পায়ে সর্ষের তেল মেখে হা ডু ডু খেলে, আমি সেসবের মাঝে নেই, চুপচাপ ক্লাশে বসে উশখুশ করতে থাকি কখন ছুটি হবে আর কখন বাসায় যাব। এর মাঝে আমি একদিন একটা ভয়ংকর ঘটনা দেখলাম।

আমাদের স্কুলটিতে পাশাপাশি অনেকগুলি ক্লাশ ছিল, মাঝখানে পার্টিশন নেই বলে সবাইকে এক সাথে দেখা যায়। নিচু ক্লাশ থেকে সব সময়েই দেখতে পাই উঁচু ক্লাশের ছেলেরা মাস্তানী করছে। একদিন দেখলাম স্কুলের সবচেয়ে বড় মাস্তান ছেলেটি সব চেয়ে নিরীহ ছেলেটির নাক চেপে ধরল। আমি তখনো শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিভাবে কাজ করে সেগুলি ভাল জানি না। বেচেঁ থাকতে হলে নিঃশ্বাস যে নিতে হয় আর নিঃশ্বাস নেবার জায়গা হচ্ছে নাক এইটুকু মাত্র শিখিছি। কাজেই কেউ যদি সেই নাক চেপে ধরে তাহলে মানুষটা যে নিঃশ্বাস নিতে না পেরে মারা পড়বে সে ব্যাপারে আমার এতটুকু সন্দেহ ছিল না। এই স্কুলের মাঝেই যে একজন আরেকজনকে মেরে ফেলছে ব্যাপারটা তখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু নিজের চোখে দেখছি ব্যাপারটা অবিশ্বাস করি কেমন করে? আমার ইচ্ছে হল ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি, কিন্তু অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে রুদ্ধ-শ্বাসে বসে রইলাম। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে ছেলেটা নিঃশ্বাস আটকে চোখে উল্টিয়ে দড়াম করে নিচে পড়ে মরে যাবে। তখন পুলিশ আসবে,

মিলিটারী আসবে, হৈ চৈ শুরু হবে, কে জানে আমাদের সবাইকে হয়তো ধরে নিয়ে যাবে!

দীর্ঘ সময় কেটে গেল, যার নাক চেপে ধরে রাখা আছে সে মারা যাবার কোন লক্ষণ দেখাল না বরং হাসি হাসি মুখ করে দাড়িয়ে রইল এবং আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম নাক চেপে ধরে রাখলে কেউ মারা যায় না। আমার সাদাসিধে মস্তিষ্কের জন্যে সেটা ছিল একটা যুগান্তকারী তথ্য।

কিশোরী মোহন পাঠাশালার কাজকর্ম ছিল খুব সরল। স্কুলের বেঞ্চে ছেলেমেয়েরা গাদাগাদি করে বসে থাকত। সামনে নড়বড়ে একটা চেয়ারে পা তুলে বসে থাকতেন একজন মাষ্টার। সেই মাষ্টার খুব যত্ন করে কান চুলকাতে চুলকাতে মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে একটা হুংকার দিতেন। পড়াশোনার ব্যাপারটা ছিল বাড়াবাড়ি রকম সরল। মাষ্টার মাঝে মাঝে হাই তুলতে তুলতে বলতেন, " অমুকটা পড়" কিংবা "অমুকটা কর"। ছাত্রছাত্রীরা সেগুলি পড়ত না হয় করত। মাষ্টার মাঝে মাঝে খাতা দেখতেন মন মেজাজ খারাপ থাকলে যারা ভুল করছে তাদের বেধরক পেটাতেন।

ক্লাশে যখন আমাদেরকে কিছু করতে দেওয়া হত আমি কখনোই কিছু বুঝতাম না। ফ্যাকাসে দিশেহারা চোখে শেফুর দিকে তাকাতাম। শেফু আমাকে ফিস ফিস করে বলে দিত কি করতে হবে। আমি শুকনো মুখে দুরু দুরু বুকে সেগুলি করতাম।

একদিন ক্লাশে বসে আছি স্যার হুংকার দিয়ে দুইটা অংক করতে দিলেন। বড় বড় যোগ অংক, করতে গিয়ে আমার কালো ঘাম ছুটে গেল। যাদের যাদের করা হয়েছে তারা খাতা স্যারের টেবিলে রেখে এসেছে– আমিও শেফুর পিছু পিছু খাতা জমা দিয়ে বসে আছি। স্যার ফার্স্ট বয়ের খাতাটা দেখলেন প্রথমে, দুটো অংকই ঠিক হয়েছে। তখন তার উপর ভার দিলেন অন্যদের খাতা দেখে দিতে, সে মহা উৎসাহে খাতা দেখতে লাগল। স্যার কান চুলকাতে চুলকাতে একটা বেত হাতে নিয়ে চেয়ারে পা তুলে বসলেন। যাদের অংক ভুল হয় নি তারা খাতা ফেরৎ পেল। অন্যদের খাতা ফেরৎ নেবার আগে স্যারের সামনে হাত পাততে হবে। যাদের একটা অংক ভুল হয়েছে তাদের হাতে শপাং করে একবার বেত এসে পড়বে, যাদের দুটি ভুল হয়েছে তাদের হাতে শপাং শপাং করে দুইবার।

আমার বোন শেফু তার খাতা ফেরৎ পেয়ে গেছে, আমি পাই নি। তার মানে নিশ্চয়ই আমার অংক ভুল হয়েছে। ভয়ে আতংকে আমার মুখ শুকিয়ে গেছে। শেফুর দুশ্চিন্তা আমার থেকেও বেশী। আমার কানে ফিস ফিস করে বলল, "গিয়ে বলবি, স্যার মাফ করে দেন, আর কোন দিন ভুল হবে না।"

এমনিতেই কথা বলতে গেলে আমার তোতলামো এসে যায় আর এরকম অবস্থায় মুখ ফুটে কিছু একটা বলা তো মোটামুটি অসম্ভব ব্যাপার। তবু আমি মনে মনে কয়েকবার চেষ্টা করে প্রস্তুত হয়ে থাকলাম। আমার বুক ধুক ধুক করছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। বসে বসে দেখছি একজন একজন করে যাচ্ছে আর স্যার বেত দিয়ে মারছেন। বাচ্চাগুলি চিৎকার করে হাত সরিয়ে নিচ্ছে কিন্তু কোন মুক্তি নেই। আবার হাত এগিয়ে দিতে হচ্ছে আর শপাং করে হাতের উপর বেত নেমে আসছে। তারপর হাতটাকে বুকের মাঝে চেপে ধরে একেকজন চোখ মুছতে মুছতে খাতা নিয়ে ফিরে আসছে।

ভয়াবহ একটা বিভীষিকার মাঝে বসে আছি, বেঁচে আছি না মরে গেছি নিজেই টের পাচ্ছিনা। এক সময় শেফু আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "যা, তোকে ডাকছে।"

আমি কাদোঁ কাদোঁ হয়ে বললাম, "আমি?"

"হ্যাঁ। যা। গিয়ে বলবি স্যার মাফ করে দেন। আর কোনদিন ভুল হবে না। মনে আছে তো?"

আমি মাথা নাড়লাম, "মনে আছে।"

স্যার খাতা দেখে বললেন, "দুইটা ভুল। হাত পাত।"

তাকে দেখতে লাগল একটা রাক্ষসের মত, মনে হল আমার পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ঢোক গিলে শুকনো গলায় কোন মতে বললাম, "স্যার মাফ করে দেন।"

স্যার আবার হুংকার দিয়ে বললেন, "হাত পাত।"

প্রচন্ড ধমকে আমি কেঁপে উঠলাম কিছু বোঝার আগেই ভয়ে আমার হাত এগিয়ে গেল। ঠিক তখন আমার নিজের উপর এত লজ্জা আর ঘেন্না হল যে বলার মত নয়। মনে হল আমি এত ছোট, নীচে জঘন্য একটা প্রানী আমি বেঁচে আছি কেন? মানুষকে ধ্বংস করে দিতে হলে তাকে মনে হয় অপমান করতে হয়- সবার সামনে অপমান করতে হয়।

আমি স্যারের দিকে তার হাতে ধরে রাখা বেতের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর সেটা শপাং করে নিচে নেমে এল। প্রচন্ড যন্ত্রণায় হাতের তালু থেকে একটা আগুনের হলকা যেন সারা শরীরের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। আমি সেই অবস্থায় দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং তার মাঝে দ্বিতীয়বার বেত নেমে এল, আমার মনে হল যন্ত্রণায় বুঝি আমি মরেই গেছি।

খাতা নিয়ে আমি কাঁদতে কাঁদতে হাত মুঠি করে আমার সীটে ফিরে এসেছি। শেফু আমার হাতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল,

"খুব ব্যথা করছে?"

আমি মাথা নাড়লাম। শুধু ব্যথা নয় তার সাথে সম্পূর্ণ নূতন একটা অনুভূতি যেটার সাথে আমি পরিচিত নয়। অনুভূতিটার নাম অপমান, আমার চার পাঁচ বছরের ছোট জীবনটিতে এর আগে আমাকে কেউ অপমান করে নি। আমার চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি ঝরছে, আর আমাকে দেখে শেফুর চোখেও পানি এসে যাচ্ছে। আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "কাদিস না। এক্ষুণি ব্যথা কমে যাবে।"

খানিকক্ষণ পর ব্যথার তীক্ষ্ণ যন্ত্রনাটা সত্যি সত্যি কমে গেল, শুধুমাত্র যেখানে বেত এসে পড়েছে সেখানে টকটকে লাল দুটি দাগ ফুলে আছে। আমি যতবার হাতের দিকে তাকাই ততবার চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি বের হয়ে আসে।

দুপুরবেলা স্কুল ছুটি হওয়ার পর বাসায় ফিরে যাচ্ছি, শেফু বলল,"বাসায় গিয়ে যেন কাঁদিস না। তাহলে সবাই জেনে যাবে।"

স্কুলে অংক করতে না পেরে মার খেয়েছি ব্যাপারটার মাঝে যে একটা লজ্জা আছে সেটা যে সবার কাছে থেকে লুকিয়ে রাখতে হবে সেটা কেউ বলে না

দিলেও আমি নিজেই বুঝে গেছি। আমি চোখ মুছে ফ্যাঁস ফ্যাঁসে গলায় বললাম, "কিন্তু আমার তো খালি কান্না এসে যাচ্ছে।"

শেফু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "এই দ্যাখ-"

আমি তার দিকে তাকালাম, সে তার নাক মুখ ভেংচে বিটকেলে একটা ভঙ্গী করে রেখেছে দেখেই আমি খিক খিক করে হেসে ফেললাম। মাত্র কয়েকদিন হল সে নাক মুখ ভেংচে এরকম বিটকেলে মুখ তৈরী করা শিখেছে সেটা দেখলেই আমার হাসি পেয়ে যায় আর আমি খিক খিক করে হাসতে শুরু করি! শেফু নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে বলল, "আর চিন্তা নেই। বাসায় গিয়ে যখনই তোর কান্না পাবে আমার দিকে তাকাবি। আমি মুখটা এরকম করে রাখব- সাথে সাথে তোর হাসি উঠে যাবে!"

বুদ্ধিটা আমার দারুণ পছন্দ হল, আমি আগেও দেখেছি সব ব্যাপারেই শেফুর বুদ্ধি আমার থেকে অনেক বেশী সরেস।

বাসায় ঢুকেই দেখা হল মায়ের সাথে, সাথে সাথে আমার চোখ ভেঙ্গে পানি বের হয়ে আসার অবস্থা হল। অবস্থা বেগতিক দেখে শেফু তার মুখ ভেংচে নেচে কুদে আমাকে হাসানোর চেষ্টা করতে শুরু করে, কিন্তু কোন লাভ হয় না। আমি হাউ মাউ করে, কাঁদতে শুরু করলাম। সে কী কান্না- যত দুঃখ কষ্ট লজ্জা অপমান সব যেন এই কান্না দিয়ে আমার মায়ের কাছে তুলে দেব।

সব শুনে আমার মা আমাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন আর আবার আমার মনে হতে লাগল যে না আমি লজ্জা পাওয়ার আর ঘেন্না পাওয়ার তুচ্ছ একটি মানুষ নেই। আমার জীবনের একটা অর্থ আছে।

রাত্রে আমি আমার অংক খাতা নিয়ে বসেছি। যে অংক ভুল করে আমার জীবনের প্রথম বার মার খেয়েছি সেই অংকগুলি ঠিক করে করব, অপমানের একটা গতি করব।

প্রথম বার অংক দুটি করলাম আবার আগের মতই ভুল উত্তর বের হল। আবার করলাম আবার ভুল। আরো কয়েকবার করলাম কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারি না। প্রত্যেকবারই ভুল উত্তর বের হয়ে আসে। বাবা কাছে বসেছিলেন, অংক দুটি দেখে বললেন,"তোর অংক তো ভুল হয় নি ঠিকই আছে।"

"ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ।"

আমার তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, হাতে এখনো টকটকে লাল দাগ। আবার জিজ্ঞেস করলাম, "অংক ভুল হয় নাই?"

বাবা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "না বাবা। কোন ভুল হয় নাই। শুধু শুধু তোকে মেরেছে।"

আমার জীবনের প্রথম পিটুনীটি আমি খেয়েছিলাম সম্পূর্ণ বিনা কারণে। কে জানে এর মাঝে আর কোন অর্ন্তনিহিত অর্থ লুকানো ছিল কী না!

গণ ঐক্য ও কচু পাতা

ছেলেবেলায় আমার সবচেয়ে অপছন্দের কাজ ছিল স্কুলে যাওয়া। স্কুলে না যাওয়ার জন্যে এমন কোন কাজ নেই যেটা চেষ্টা করে দেখি নি। দোয়া দরুদ পড়ে দেখেছি সেগুলি বেশী কাজে আসত না। অসুখ বিসুখ বাধানোর চেষ্টা করে দেখেছি সেটাও লাভ হয় নি। ঠিক যখন স্কুলে যাবার সময় হত ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে দেখেছি সেটাও ভাল কাজ করে নি। এক দুইদিন পর যখন ব্যাপারটা সবাই বুঝে ফেলল আমাকে ঘুম থেকে তুলে ঠেলে ঠুলে স্কুলে পাঠানো শুরু করে দিল।

খুব ছেলেবেলায় আমি মোটেও স্কুলে যেতে চাইতাম না, না গেলে যে খুব ক্ষতি হত সেটা মনে হয় সত্যি নয়। স্কুলে গিয়ে কিছু শিখেছি বলে মনে হয় না। যতক্ষণ ক্লাশ হত দাঁত মুখ খিচিয়ে বসে থাকতাম স্কুলের ছুটির ঘন্টা বাজলে এক ছুটে বাসায় ফিরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাচতাম।

স্কুলে গিয়ে আমি যে একেবারে কিছুই শিখি নি তা নয়, দুটি জিনিষ শিখেছিলাম, একটা হচ্ছে গণঐক্য এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে কচুপাতার উপকারীতা। ঘটনাটা তাহলে খুলে বলা যাক।

একদিন স্কুলে গিয়ে দেখি রাত্রে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়ে চারিদিকে পানি থৈ থৈ করছে। স্কুলের মেঝে পর্যন্ত পানিতে ভিজে চুপচুপে। তবে আমাদের কপাল খারাপ বৃষ্টির ঝাপটা বেঞ্চ পর্যন্ত পৌছাতে পারে নি, সেগুলি শুকনো খটখটে। যদি বৃষ্টিতে বেঞ্চগুলিও ভিজে যেতো আজকে তাহলে আর ক্লাশ করতে হত না।

আমরা যখন লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাগ্যকে মেনে নিচ্ছিলাম তখন একজনের মাথায় হঠাৎ লাখ টাকার বুদ্ধি খেলে গেল। সে বলল, "চল, আমরা বেঞ্চি গুলি ভিজিয়ে দিই।"

"কি ভাবে ভিজাবি?"

"সোজা!। ঐ দেখ কচু পাতা। কচু পাতায় করে পানি এনে বেঞ্চের উপরে ঢেলে দেব।"

যেই কথা সেই কাজ। ক্লাশের সবাই কচুপাতা করে পানি এনে বেঞ্চের মাঝে ঢালতে লাগল. আমি যে এত বড় হাবাগোবা নিরীহ গোবেচারা মানুষ আমার মাঝেও কাজ করার উৎসাহ একেবারে বান ডাকতে লাগল। আমিও ছুটে ছুটে কচুপাতায় করে পানি আনতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মাঝেই ক্লাশঘর আর প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে কোন পার্থক্য রইল না। একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার যে কী আনন্দ সেই প্রথমবার আমি টের পেলাম। স্যার ক্লাসে এসে ক্লাশের অবস্থা দেখে সাথে সাথে ছুটি দিয়ে দিলেন। গণ ঐক্য এবং কচুপাতায় কী রকম

বিপ্লব করে ফেলা যায় দেখে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

কচুপাতা এর পরেও আমি খুব উপকারী একটা জিনিস হিসেবে আবিষ্কার করছিলাম। আমার এক দুষ্টু বন্ধু সেটা ব্যাবহার করেছিল নচ্ছাড় এক বন্ধুকে শায়েস্তা করতে। একদিন সে একটা কচুপাতা নিয়ে এসে বলল, "একটা ম্যাজিক দেখবি?"

"কি ম্যাজিক?"

"তিনজন এই কচুপাতায় থুতু ফেললে দেখবি থুতুর রং হয়ে যাবে নীল।

"সত্যি?"

"বিশ্বাস না হলে দেখ"- বলে বন্ধুটি নিজে থুতু ফেলে কচুপাতাটি আমার দিকে এগিয়ে দিল। কচুপাতায় পানি সব সময় টলটল করতে থাকে সেখানে তার থুতুও টলটল করছে। আমি সাবধানে থুতু ফেললাম। দুষ্টু বন্ধু তখন কচুপাতাটি এগিয়ে দিল নচ্ছাড় বন্ধুর দিকে, নচ্ছাড় বন্ধু যেই মুখ এগিয়ে এনেছে থুতু ফেলার জন্যে দুষ্টু বন্ধুটি তখন কচুপাতার থুতুটুকু ছুড়ে দিয়েছে তার মুখে। হতচকিত নচ্ছাড় বন্ধুটি যখন বোঝার চেষ্টা করছে কি হচ্ছে ততক্ষণে দুষ্টু বন্ধুটি ছুটতে ছুটতে পালিয়ে একেবারে দেশ ছাড়া হয়ে গেছে।

কেউ অস্বীকার করবে না কাজটি ছিল একেবারে নীচু স্তরের কাজ কিন্তু আমরা যারা ঘটনাটি দেখেছিলাম তারা একেবারে উচু স্তরের আনন্দ পেয়েছিলাম। ছোট হওয়ার মজাই হচ্ছে এটা!

বিস্কুটের মালা

স্কুল যখন মোটামুটি অসহ্য হয়ে গেল তখন একদিন শুনতে পেলাম স্কুলে গরমের ছুটি হবে। একদিন দুইদিন নয়-পুরো এক মাস। শুনে আমার বুকের মাঝে আনন্দের বান ডেকে গেল।

যেদিন স্কুল দুটি দেয়া হবে সেদিন সকালে ক্লাশ, কোন পড়াশোনা নেই। নাম ডেকেই ছুটি ঘোষণা করে দেয়া হয়। শুধু তাই না সব ছেলেমেয়েরা সেদিন স্কুলে ফুলের মালা নিয়ে যায়, স্যার যখন ছুটির কথা বলেন তখন সবাই মিলে স্যারের গলায় মালা পড়িয়ে দেয়।

অন্য সবাই ব্যাপারটা জানত, তারা আগে থেকে স্কুলে যাচ্ছে, ফুলের মালা নিয়ে তারা আগেও স্কুলে গেছে। কিন্তু আমি একেবারে নতুন ফুলের মালা নিতে হয় সেই খবরটি পেয়েছি মাত্র আগের দিন। তখন ফুলের খোঁজে বের হয়ে দেখি এই এলাকায় ফুল দূরে থাকুক কলিটিও নেই। এই এলাকায় স্কুলের যত ছেলেমেয়েরা আছে গাছের সব ফুল ছিড়ে নিয়ে চলে গেছে। আমি হন্যে হয়ে খুঁজে কিছু না পেয়ে খুব মন খারাপ করে বাসায় ফিরে এলাম। সবাই কী সুন্দর ফুলের মালা তৈরী করছে শুধু আমার কাছে কিছু নেই।

আমাকে এরকম মুখ কালো করে থাকতে দেখে বাবা বললেন, "আরে, স্যারদের ফুলের মালাই দিতে হবে সেটা কে বলেছে?"

"তাহলে কি দেব?"

"বিস্কুটের মালা।"

"বিস্কুটের মালা?"

"হ্যাঁ। বিস্কুট সূতা দিয়ে গেঁথে গেঁথে দিবি দেখিস কি সুন্দর মালা হবে।"

আমি তখনও ব্যাপারটা ধরতে পারছি না। আমি নেহায়েৎ হাবাগোবা মানুষ, সহজে কেউ আমার সাথে ঠাট্টা করে না, তবু অবিশ্বাসের গলায় বললাম, "বিস্কুটের মালা? সত্যি?'

"সত্যি? আয় তোকে তৈরী করে দিই।"

তখন তখনি দোকান থেকে বিস্কুট কিনে আনা হল। সুইয়ের মাঝে সূতা লাগিয়ে সেই বিস্কুটগুলি কায়দা করে গেঁথে গেঁথে দেয়া হল। মাঝখানে মাঝখানে মুড়ি। কিছুক্ষণের মাঝেই চমৎকার একটা মালা তৈরী হল, সেটা দেখতে যে রকম ভাল খেতে নিশ্চয়ই তার থেকে ভাল! আমার মুখে হাসি আর ধরে না।

পরদিন ভোরে চারিদিকে ঈদের মত আনন্দ। পরিষ্কার জামা কাপড় পরে সবাই স্কুলে যাচ্ছে, সবার হাতেই ফুলের মালা। আমার কাছে ফুলের মালা নেই সত্যি কিন্তু রয়েছে তার থেকেও মজার জিনিস বিস্কুটের মালা।

বিস্কুটের মালা হাতে নিয়ে বের হয়েই আমার কিন্তু লজ্জা লাগতে শুরু করল, বিস্কুটের মালা দেখে কেউ আবার হাসাহাসি করবে না তো? এদিকে

সেদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি স্কুল ব্যাগের মাঝে বিস্কুটের মালাটি লুকিয়ে ফেললাম।

ক্লাশে প্রায় সবার হাতেই একটা ফুলের মালা। একজনের সাথে আরেকজন নিজের মালার তুলনা করছে। কারটা কত ভাল এবং মালাটা পেয়ে স্যার কী রকম খুশী হবেন সেটা নিয়ে জল্পনা কল্পনা হচ্ছে। আমি শুধু জল্পনা কল্পনা থেকে বাইরে- সবাই ধরে নিয়েছে আমার কোন কিছু নেই। আমি এমনিতেই বেশী কথাবার্তা বলি না। কেউ তাই আমাকে ঘাটাঘাটিও করছে না।

স্কুলের ঘন্টা পড়ল, স্যার ক্লাশে এসে ঢুকলেন। স্যারের মুখে মৃদু হাসি, আমাদের মুখে মৃদু নয় এগাল ওগাল জোড়া হাসি। রোল কল করা হল এবং তারপরেই স্কুলের নোটিশ। স্যার স্কুল ছুটির নোটিশটা মাত্র পড়েছেন ঠিক তখন সব ছেলেমেয়ে চিৎকার করে মালা নিয়ে স্যারের দিকে ছুটে গেল।

আমি বিস্ফোরিত চোখে দেখলাম ফুটবল মাঠে বলের উপর প্লেয়াররা যেভাবে ঝাপিয়ে পড়ে সবাই সেভাবে স্যারের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে। একজন আরেকজনকে ডিঙ্গিয়ে, কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে ধাক্কাধাক্কি করে, ঠেলে ঠুলে, খামচা খামচি করে কিলিয়ে পিটিয়ে গুতিয়ে চিৎকার করতে করতে মালা দিচ্ছে। ফুলের মালা দেওয়া সর্ম্পকে আমার মনে যেরকম শান্ত সৌম্য একটা পরিবেশের ধারণা ছিল তার সাথে এর কোন মিল নেই। ক্লাশের মাঝখানে স্যারের উপর অসংখ্য ছেলেমেয়ে কিলবিল করছে, ভয়ংকর একটা দৃশ্য। এই ভীড়ের মাঝে হুটোপুটির মাঝে আমি আমার বিস্কুটের মালা নিয়ে কিভাবে যাব?

আমি স্কুলের ব্যাগ খুলে আমার বিস্কুটের মালাটা বের করলাম। কিন্তু এ নিয়ে সামনে যাওয়ার কোন উপায় নেই, মনে হতে লাগল আমার বুঝি আর মালা দেওয়াই হল না। আমি কী করব বুঝতে না পেরে দূর থেকেই মালাটি ভীড়ের মাঝামাঝি ছুঁড়ে দিলাম সেই মালা উড়তে উড়তে ভীড়ের মাঝখানে কোথায় গিয়ে পড়ল আমি দেখতে পেলাম না।

মালা দেওয়ার ভয়ংকর রোমহর্ষক ব্যাপারটা শেষ করে ছেলেমেয়েরা সবাই নিজেদের বেঞ্চে ফিরে এল। আমি দেখতে পেলাম স্যার চেয়ারে একজন বিধ্বস্ত মানুষের মত বসে আছেন। স্যারের চিবুক পর্যন্ত ফুলের মালা দিয়ে ঢেকে আছে আর কি আশ্চর্য আমার বিস্কুটের মালা তার কান থেকে ঝুলছে, এতদূর থেকে ছুঁড়ে দিয়েছি কিন্তু নিখুত নিশানা!

স্যার গলা থেকে ফুলের মালাগুলি খুলে খুলে সরাতে সরাতে হঠাৎ করে বিস্কুটের মালাটা আবিষ্কার করলেন। হাতে নিয়ে সেটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, "আরে এ দেখি বিস্কুটের মালা"

ক্লাশের সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, "বিস্কুটের মালা! বিস্কুটের মালা!"

"কে দিয়েছে এটা?"

আমি লাজুক এবং হাবাগোবা মানুষ। পুরো ক্লাশের সামনে দাড়িয়ে কথা বলার সাহস নেই। সামনের ছেলেটার পিছনে নিজেকে ঢেকে লুকিয়ে ফেললাম।

স্যার বিস্কুটের মালা থেকে একটা বিস্কুট ভেঙ্গে মুখে দিয়ে বললেন, "ফাষ্ট ক্লাশ বিস্কুট। ফুলের মালা থেকে বিস্কুটের মালা অনেক ভাল। খিদে লাগলে খাওয়া যায়।"

স্যার আরেকটা বিস্কুট মুখে দিয়ে বললেন, "ফুলের মালা গলায় দিলে গলা চুলকায়, সার্টে ফুলের রং লেগে যায়। গাছে কোনও ফুল থাকে না। বিস্কুটের মালায় সে রকম কোন সমস্যা নেই। ফাষ্ট ক্লাশ! কে দিয়েছে এই মালা?"

আমি আরো ভাল করে নিজেকে সামনের ছেলের আড়ালে লুকিয়ে ফেললাম।

স্বপ্ন নাকি সত্যি

একদিন স্কুল থেকে বাসায় এসে শুনি আব্বা দিনাজপুরে জগদল নামে একটা জায়গায় বদলী হয়ে গেছেন। তার মানে আমরা আর এই জায়গায় থাকব না, জগদল নামের সেই জায়গায় চলে যাব। সেটা ভাল না খারাপ আমরা জানি না, কিন্তু শুনে আমাদের খুব আনন্দ হল।

একদিন বাক্স প্যাটরা বেধে আমরা রওনা হয়েছি। প্রথমে ট্রেন, তারপরে ষ্টীমার, তারপর আবার ট্রেন, তারপর বাস, সবার শেষে মোষের গাড়ী। মোষের গাড়ি আমরা কখনো চড়ি নি, সেখানে চড়ে আমরা আবিষ্কার করলাম এর থেকে মজার আর কিছু হতে পারে না। সেটা ক্যাচ ক্যাচ একরকম শব্দ করতে করতে যায়, যাওয়ায় সময় সেটা ক্রমাগত দুলতে থাকে, মনে হয় দোলনা চড়ছি। যে মানুষটি মোষের গাড়ী চালায় তার হাতে একটা বিশাল লাঠি সেটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে মুখে আজব ধরণের শব্দ করতে থাকে। সেই সব শব্দের নিশ্চয়ই অর্থ আছে যেটা শুধু মোষেরা বুঝতে পারে। মোষের গাড়ীর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে অন্য জায়গায়, চলতে চলতে ইচ্ছে হলেই পিছন দিয়ে নেমে যাওয়া যায়, তখন মোষের গাড়ীর পিছু পিছু হেঁটেও যাওয়া যায়। নির্জন রাস্তায় কোথাও কোন জন মানুষ নেই। দুই পাশে নিবিড় জংগল কে জানে সেখানে বাঘ ভাল্লুক আছে কী নেই। সব মিলিয়ে কী আশ্চর্য এক রহস্যময় পরিবেশ।

মোষের গাড়ীর পিছনে হাঁটতে হাঁটতে আমি যখন প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেছি যে এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না এবং বড় হলে আমার একটা মোষের গাড়ী কিনতে হবে, যেটা হবে আমার নিজের আর আমি নিজে নিজে সেটা চালিয়ে চালিয়ে ঘুরে বেড়াব–ঠিক এরকম সময়ে মোষের গাড়ীর একটা সমস্যা আবিষ্কার হল প্রায় হঠাৎ করেই।

রাস্তার উল্টোদিক দিয়ে হঠাৎ একটা ট্রাক ছুটে এল। এই মোষগুলি কখনো ট্রাক দেখেনি, কি ভেবেছে কে জানে, ট্রাকের শব্দ শুনে হঠাৎ তারা লেজ তুলে ছুট লাগালো। রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ল মাঠে, মাঠ পার হয়ে নদীতে। নদীতে পুরো শরীর ডুবিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত শান্ত হল। মোষেরা মনে হয় পানি খুব ভালবাসে। সেই পানিতে শরীর ডুবিয়ে নিলে তাদের বুকে সাহস ফিরে আসে তাদের মনে হয় আর কেউ বুঝি তাদের দেখতে পাচ্ছে না।

মোষের গাড়ী যখন নদীতে নেমে পড়ে তখন সেটাকে তুলে আনা খুব সহজ কর্ম নয়। যখন অনেকগুলি মানুষ মিলে ধাক্কা ধাক্কি করে মোষের গাড়ীটাকে

উপরে তুলে আনছিল তখন আমি মত পাল্টালাম, মনে হল মোষের গাড়ি না কিনে একটা সাইকেল কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

জগদল জায়গাটাতে পৌঁছে মনে হল আমরা বুঝি পৃথিবীর বাইরে চলে এসেছি, গহীন একটা জংগলের মাঝে বিশাল একটা দালান। মানুষজন বলতে গেলে কেউ নেই, চারিদিক নির্জন সুমসাম। বাসার পাশে একটা মন্দির সেই মন্দিরের ভিতরে দেবমূর্তি। সামনে একটা কুয়া তার শান বাধানো চত্বর। একটু হেঁটে গেলেই ঘন জংগল। সেখানে একটা পুরানো গাড়ী, গাড়ীর ভিতর থেকে গাছপালা বের হয়ে আসছে। পাশে অনেকগুলি তাল গাছ সেই তাল গাছ থেকে বাবুই পাখির বাসা ঝুলছে। বাসা থেকে একটু হেঁটে গেলেই নদী, চিক চিকে বালুর উপর টল টলে পানি। ঝকঝকে সেই পানি কাঁচের মত স্বচ্ছ। সব দেখে মনে হয় বুঝি স্বপ্নের দেশে চলে এসেছি।

সেই দেশটি সত্যিই ছিল স্বপ্নের দেশ। একটা বাচ্চার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন যে তাকে স্কুলে যেতে হবে না। জগদলে এসে আমরা জানতে পারলাম আশে পাশে বিস্তৃত এলাকায় কোন স্কুল নেই সত্যিই তাই আমাদের কারো স্কুলে যেতে হবে না।

এ যদি স্বপ্নের দেশ না হয় তাহলে স্বপ্নের দেশ আর কী হতে পারে?

জগদল জায়গাটিতে যে কারণে আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না ঠিক সে কারণে বাবা মায়েরা জায়গাটাকে পছন্দ করলেন না। আমরা তখন সব মিলিয়ে প্রায় আধ ডজন ভাইবোন তাদের কেউ স্কুলে যাচ্ছে না ব্যাপারটা গ্রহন করা কঠিন। সন্ধ্যেবেলা হারিক্যান জ্বালিয়ে সবাইকে জোর করে বসিয়ে পড়াশোনা করানোর চেষ্টা করা হয় কিন্তু আমরা তো আর কেউ বিদ্যাসাগর নই যে স্কুলে না গিয়ে ঘরে বসে বসে নিজেরা নিজেরা পড়ে ফেলব।

আব্বা তখন চেষ্টা চরিত্র করে বদলী হয়ে গেলেন। প্রথমে পচাগড়। সেখানে কিছুদিন থেকে রাঙামাটি। সেখানে কিছুদিন থেকে বান্দরবন। একেকটা জায়গার একেকটা নাম হয় কিন্তু জায়গাটার সাথে নামের কোন মিল থাকে না। পচাগড়ে কোন পচা জিনিষ ছিল না (স্কুলটা পছন্দ হয় নি কিন্তু সেটা তো জানা কথা) রাঙামাটিতেও মাটি মোটেও রাঙা ছিল না কিন্তু বান্দরবন এসে আমরা সত্যিই হতবাক হয়ে গেলাম, সত্যি সত্যি এটি বান্দরবন। বান্দরবনের মাঝে দিয়ে চলে গেছে শঙ্খ নদী, নদীর এ পাশে ছোট শহর অন্যপাশে পাহাড় এবং বন এবং সেখানে সত্যি সত্যি লক্ষ লক্ষ বানর। পৃথিবীতে যত প্রানী আছে তার মাঝে দেখতে সবচেয়ে মজার যে প্রানী সেটা হচ্ছে বানর। এই বানর যদি স্বাধীন ভাবে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায় তাহলে কথাই নাই। আমরা নদীতীরে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বানরদের দেখতাম, এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে পড়ছে, গাছের ডালে বসে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে, অন্য একজনকে খামাখা একটা থাবড়া মেরে বসছে, ছোট বানর মায়ের ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে লেজ ধরে ঝুল খাচ্ছে, দুষ্টুমি করে একজন আরেকজনকে তাড়া করছে এক কথায় অপূর্ব একটি ব্যাপার। বানরগুলি এত মজা করত যে কেন আমার বানর হয়ে জন্ম হল না ভেবে ভারী দুঃখ হত।

বান্দরবনে স্কুলটি ছিল ঠিক আমার বাসার সামনে। স্কুলের ঘন্টা বাজলে আমরা সার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে দৌড়ে ক্লাশে গিয়ে হাজির হতে পারতাম। আমাদের ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের দুইভাগে ভাগ করা যেতো, বাঙালি আর মগ। আমরা অল্প কয়জন বাঙালী বাকী সবাই মগ। যারা বাঙালী তারা সবাই ছয়সাত বছরের, যারা মগ তাদের একদুই জন ছাড়া সবাই মুশকো জোয়ান। লেখাপড়া সব হত বাংলা ভাষায় কাজেই তাদের খুব অসুবিধে হত কিন্তু তারা কখনো সেটা নিয়ে নালিশ করত না। তাদের বেশির ভাগ ক্লাশে পাথরের

মূর্ত্তির মত চুপ করে বসে থাকত, গোলমাল দুষ্টুমী এবং বাদরামো যা করার তা করত বাঙালীরা।

আমরা একদিন টিফিন ছুটিতে বাইরে ছোটাছুটি করছি হঠাৎ দেখলাম একটা সাপ কিলবিল করে ছুটে যাচ্ছে। সাপ বিষাক্ত হোক আর নির্বিষ হোক, ছোট হোক আর বড় হোক সেটা দেখলেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার নিয়ম, তাই আমরাও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটতে লাগলাম। আমাদের মগ বন্ধুরা কিন্তু ছোটাছুটি করল না। তারা নিজেদের মাঝে গুজ গুজ করে খানিকক্ষণ কথা বলে হেড মাস্টারের ঘরে গিয়ে হাজির। হেডমাস্টারকে তারা কি বলল কে জানে তিনি সাথে সাথে স্কুল ছুটি দিয়ে দিলেন। ঢং ঢং করে ছুটির ঘন্টা পড়ল আর সাথে সাথে হৈ হৈ করে সব ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে বের হয়ে এল। বাঙালি ছেলে মেয়েরা যখন বাসায় রওনা দিয়েছে তখন দেখা গেল মগ ছেলেমেয়েরা বইপত্র স্কুলের বারান্দায় রেখে মাঠে নেমে এসেছে। তারা একটু পরেই মাঠের আনাচে কানাচে সাপ খুঁজতে লাগল।

আমার ধারণা ছিল সাপেরাই আমাদের খুঁজে বের করে আমরা সাপদের কখনো খুঁজে পাই না, কিন্তু এবারে দেখা গেল সেটা সত্যি না। মগ ছেলেমেয়েরা সত্যি সত্যি সাপ খুঁজে পেতে শুরু করে, একটি দুটি সাপ নয় ,শত শত সাপ। ছোট সাপ, বড় সাপ, মাঝারী সাপ, রোগা সাপ, মোটা সাপ, চকচকে সাপ, ভুসভুসে সাপ, সে যে কত রকম সাপ বুঝিয়ে বলা যাবে না। সাপ দেখলে আমরা যে রকম প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাই মগ ছেলেমেয়েরা মোটেই সেটা করে না, পিছন থেকে ছুটে গিয়ে সাপের লেজ জাপটে ধরে ফেলে। তারপর সাপ কিছু বোঝার আগে তার লেজে ধরে এমন একটা ঝাঁকুনী দেয় যে সাপ বেচারার বারটা বেজে যায়। দেখতে দেখতে তাদের হাতে সাপের বান্ডিল বড় হয়ে উঠে, মানুষ যেমন করে বাজার থেকে সজনে বা ডাঁটাশাক কিনে আনে তাদের হাতে ঠিক সেরকম সাপের আঁটি। মগ ছেলেমেয়েরা মহানন্দে সেই সাপের আঁটি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

একজনকে জিজ্ঞেস করলাম কি করবে সাপ দিয়ে, হেসে ঝলমল করে বলল রান্না করে খাবে। সাপের ঝোল নাকি ভারী মজা খেতে।

ড্রয়িং টিচার

বান্দরবনে আমি ক্লাশ টু'তে পড়ি। এর মাঝে আমার প্রায় এক গন্ডা স্কুল এবং কয়েক গন্ডা মাস্টার দেখা হয়ে গেছে- কিন্তু তখন পর্যন্ত কোন মাস্টারই আমার মনে দাগ কাটতে পারে নি। স্কুলকে সব সময়েই মনে হত বিভীষিকা, স্কুলের মাস্টারেরা সেই বিভীষিকার নায়ক- মনে দাগ কাটবে কেমন করে?

বান্দরবন স্কুলে এসে প্রথম একজনকে পাওয়া গেল যার কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে, তিনি হচ্ছেন আমাদের ড্রয়িং টিচার- একজন মগ মহিলা।

মহিলা যখন আমাদের ড্রয়িং ক্লাশ নিতে এসেছেন তখন তার বয়স হয়েছে। মহিলার দিকে তাকালে প্রথম যে কথাটা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে তিনি ছিলেন অসুন্দরী। মানুষের চেহারা নিয়ে কিছু বলতে নেই, জন্মের পর থেকে সেটা শিখে এসেছি কিন্তু এই ড্রয়িং টিচারের বেলায় সেটা বলতেই হবে। ভদ্র মহিলার সাদামাটা বয়স্কা চেহারা কিন্তু গলায় ছিল গলগন্ড রোগ প্রথমবার দেখে আমরা সবাই ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম। পরণে মগদের ব্লাউজ এবং লুঙ্গি। বাংলা প্রায় জানেন না যেটুকু জানেন সেটা হচ্ছে মগ ভাষার কাছাকাছি। আমাদের ক্লাশে ড্রয়িং টিচার হিসেবে এসেছেন কিন্তু তিনি ছবি আঁকার কিছু জানতেন না জীবনে ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন বলেও মনে হয় না।

প্রথম দিন ক্লাশে এসে মগ এবং বাংলাভাষা মিশিয়ে কিছু একটা বললেন, চেষ্টা করে সেটাকে বাংলায় অনুবাদ করে বুঝতে পারলাম তিনি বলছেন "সবাই বেগুন আঁক"।

বেগুন দেখতে কেমন হয় আমরা সবাই জানি কিন্তু কেমন করে আঁকতে হয় সেটা সবাই জানে না। তবু আমরা প্রাণপন চেষ্টা করতে থাকি। কারো বেগুন দেখতে হল লাউয়ের মত, কারো হল ফুটবলের মত, কারো হল ডিমের মত ,কারো হল লাটিমের মত। যতক্ষণ আমরা ছবি আঁকছি আমাদের নূতন ড্রয়িং টিচার ঘুরে ঘুরে আমাদের ছবি আঁকা দেখতে লাগলেন এবং মাথা নাড়তে লাগলেন কিন্তু কেমন করে বেগুন আঁকতে হয় সেটা নিয়ে কোন রকম উপদেশ বা সাহায্য করার ধারে কাছে গেলেন না।

সবার আগে ছবি আঁক শেষ হল সলীলের, সে তার শ্লেট নিয়ে গেল ড্রয়িং টিচারের কাছে। সলীল বড় দরের শিল্পী নয়। তার বেগুনের ছবিটা দেখতে হয়েছে একটা বড় সাইজের মর্তমান কলার মত কিন্তু সেটা দেখেই ড্রয়িং টিচার একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বড় বড় চোখ করে মাথা নাড়তে নাড়তে তাকে নম্বর দিলেন—সেই দেখে আমরা হতবাক। বরাবর আমরা দশের ভিতরে পাঁচ

ছয় বড় জোর সাত কিংবা আট পেয়েছি। কিন্তু সলীল পেয়েছে দুইশ! কতর ভিতরে দুইশ বলা নেই কিন্তু নম্বরটি যে দুইশ সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একটা বেগুন একে কেউ যে দুই শ নম্বর পেতে পারে নিজের চোখে না দেখলে আমরা কেউ বিশ্বাস করতাম না।

তাড়াতাড়ি আরো কয়েকজন তাদের বেগুনের ছবি শেষ করে নিয়ে গেল এবং সেইসব ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে আমাদের ড্রয়িং টিচার কাউকে আড়াইশ, কাউকে তিনশ কাউকে সাড়ে তিনশ নাম্বার দিতে লাগলেন। সারা ক্লাশে একটা আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। কঠিন কঠিন গুণ অংক করে বড় বড় ইংরেজী ট্রানশ্লেষান বা বাংলা ব্যাকরণ পড়ে এতদিন মাত্র ছয় সাত করে নম্বর পেয়ে এসেছি অথচ আজকে একটা বেগুন এঁকেই সবাই দুই তিন শ করে নম্বর পেয়ে যাচ্ছে । কি মজা!

আমি দ্রুত আমার বেগুনটা শেষ করে ফেললাম। ছোটবেলা থেকেই আমার আঁকার হাত ভাল, আমার বেগুনটাও হল একেবারে সত্যিকারের বেগুনের মত। মোটা সোটা নাদুস নুদুস বেগুন, উপরে ডাঁটাটা একটু বাকা হয়ে আছে, সেখানে ছোট ছোট বিন্দু দেখে আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি সেটা নিয়ে ছুটে গেলাম আমার ড্রয়িং টিচারের কাছে—সেটা দেখে ড্রয়িং টিচারের চোখে আর পলক পড়ে না। মুগ্ধ হয়ে খানিকক্ষণ বেগুনের দিকে খানিকক্ষন আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর আমার খাতায় নম্বর দিলেন–ছোট খাট নম্বর নয়, একেবারে পুরো সাড়ে বার শ! আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না—সত্যিই আমি সাড়ে বার শ পেয়েছি? আনন্দে চিৎকার করে আমি আমার ড্রয়িং টিচারের দিকে তাকালাম। তিনিও আমার দিকে স্নেহের হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছেন।

আমার হঠাৎ মনে হল এত সুন্দরী মহিলা বুঝি সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই!

একদিন বিকাল বেলা মাঠে খেলছি হঠাৎ কে যেন ভয়ে চিৎকার করে উঠল। মাথা ঘুরিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। একটা মানুষকে কেউ তার মাথায় পিছন থেকে ছোরা মেরেছে, সেই ছোরা মাথা ফুটো করে কপাল দিয়ে খানিকটা বের হয়ে এসেছে, রক্তে সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে। মানুষটা সেই অবস্থায় থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে। আমার ভাবলাম মানুষটা এক্ষুনি বুঝি দড়াম করে পড়ে যাবে, কিন্তু সে পড়ল না আমাদের কাছে এসে বিড় বিড় করে বলল, "খোকারা, তোমরা আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না! আমি একজন বহুরূপী!"

বহুরূপী বলে যে কিছু থাকতে পারে, যারা শুধু মাত্র মানুষকে মজা দেখানোর জন্যে তারা কিছু একটা সেজে আসে সেটা সেই প্রথমবার দেখেছি। বান্দর বনে এরকম আরো অনেক অনেক মজার জিনিষ রয়েছে। সত্যিকারের আরাকানের ডাকাত, সত্যিকারের রাজা-রানীর রাজকন্যা, সত্যিকারের বার্মিজ গুপ্তচর, এমন কি সত্যিকারের টার্জান এই টার্জান– খালি হাতে চিতা বাঘের সাথে যুদ্ধ করে একটা কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে সেটাকে মেরে ফেলেছে। প্রত্যেকদিনই একটা রহস্যের মত। সারাদিন স্কুল করে বিকালবেলা এক রহস্য থেকে অন্য রহস্যের মাঝে ঘুরে বেড়াই। যে দিন কোন রহস্য থাকে না সেদিন নদী তীরে বসে বানরের খেলা দেখি না হয় মাঠে ফুটবল খেলি।

ফুটবল খেলা ছিল বান্দরবনের সবচেয়ে উত্তেজনার ঘটনা। তিনটি দল ছিল সেখানে, স্কুল, বাজার আর অফিসার। স্কুলের ছেলেপিলেরা মিলে ছিল স্কুল টিম, বাজারের দোকানদার ব্যাবসায়ী মিলে ছিল বাজার টিম, শহরের নানা অফিসের কর্মকর্তারা মিলে ছিল অফিসার টিম। প্রথমে তিনটা টিম নিজেরা নিজেরা খেলে তারপর বাইরে থেকে ভাড়া করা প্লেয়ার নিয়ে এসে খেলা শুরু হত। সারা শহর ভেঙ্গে পড়ত সেই খেলা দেখতে, উত্তেজনায় আমাদের নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে যেতো। খেলার মরশুমে আমাদের মুখে ফুটবল খেলা ছাড়া আর কোন কথাই থাকত না।

প্রথম যেদিন ফুটবল খেলা শুরু হয় সেদিন উত্তেজনায় আমাদের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা। আমাদের স্কুলের বড় ক্লাশের ছেলেরা খেলতে নেমেছে। তাদের রোজই স্কুলে দেখি, কখনো বিশেষ কিছু মনে হয় নি, আজকে তারা যখন স্কুলের জার্সী পড়ে নেমেছে একেকজনকে দেখাচ্ছে একেবারে রাজপুত্রের মত। তাদের দেখেই গর্বে আমাদের বুক দশ হাত ফুলে গেল।

যথা সময়ে খেলা শুরু হল। বাজারের দলের সাথে খেলা পড়েছে- বরাবরই তারা দুর্ধষ টীম, সে তুলনায় অফিসারের টীম অনেক ঢিলেঢালা। খেলা শুরু হবার একটু পরেই বুঝতে পারলাম স্কুল টীমের কপালে আজ মনে হয় দুঃখ রয়েছে— বল একটু পরে পরে শুধু স্কুল টীমের দিকে চাপতে লাগল। শুধু তাই না, দমাদম কিক করতে লাগল গোলপোস্টের দিকে।

হঠাৎ করে আমরা আমাদের স্কুল টীমের গোল কীপারের মাঝে একটা বিচিত্র জিনিস লক্ষ্য করলাম। তার চোখে মুখে কেমন জানি একটা দিশেহারা ভাব। শুধু যে দিশেহারা তাই নয়, চেহারায় কেমন জানি উদভ্রান্ত আতংকিত একটা ছাপ। আমরা দেখলাম বাজারের টীম থেকে একজন বল নিয়ে ছুটে আসছে আর আমাদের গোল কীপারের চেহারায় দিশেহারা ভাবটা যেন আরো বেশী করে ফুটে উঠল। দেখলাম বাজারের টিম থেকে গোলপোস্টের দিকে কিক করা হল আর আমাদের গোল কীপার বলকে ছেড়ে সম্পূর্ন অন্যদিকে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য কিছু একটা ধরার চেষ্টা করল।

দৃশ্যটি দেখে আমরা এত অবাক হলাম যে বলার নয়। আমাদের কাছে দাঁড়িয়েছিল আনিস। সে এই এলাকার সবকিছু খবর রাখে। গোলকীপারের ব্যাপারটাও সে আমাদের জানাল। বলল, " ফুটবল তো আর চশমা পরে খেলা যায় না, গোলকীপার তাই চশমা খুলে এসেছে। কিন্তু সমস্যা হল চশমা ছাড়া গোলকীপার সবকিছু তিনটা করে দেখে। তিনটার মাঝে মাঝখানেরটা সত্যি দুই পাশেরগুলি সত্যি নয়। কেউ যখন গোলাপোস্ট বল কিক করে, সে দেখতে পায় তিনটা বল তার দিকে ছুটে আসছে, তার ধরার কথা মাঝখানের বলটা সেটা আসল বল। কিন্তু খেলায় উত্তেজনায় তার সবসময় খেয়াল থাকে না, মাঝে মাঝে পাশের বল গুলি ধরে ফেলার চেষ্টা করে আর তখনই হয় সর্বনাশ।"

খেলাতে এমনিতেই আমাদের সর্বনাশ হত, সেবার গোল কীপারের তিনটে করে বল দেখার কারণে যা একটা কেলেংকারী হয় সেটা আর বলার মত নয়!

স্কুলে যেতে আর কার ভাল লাগে? কিন্তু ভাল না লাগলেও স্কুলে যেতে হয়, প্রত্যেকদিনই যেতে হয়। স্কুল কামাই করার একটাই সুযোগ সেটা হচ্ছে অসুখ বিসুখ। কিন্তু বাজে রকমের একটা অসুখ বিসুখ—যখন জ্বরে গা পুড়ে যায় হড় হড় করে বমি হতে থাকে, তো আর মজার জিনিস নয়- তার থেকে মনে হয় স্কুলই ভাল। যদি একটা অসুখ পাওয়া যেতো যেখানে ঠিক স্কুলে যাবার সময় দেখা যেতো জ্বর আর স্কুলে যাওয়ার সময়টা পার হবার পরই দেখা গেল জ্বর নেমে গিয়ে দিব্যি সুস্থ মানুষ তাহলে কি মজাটাই না হতো! কিন্তু সেটা কি আর সম্ভব? অসুখ বিসুখ কি আর অর্ডার দিয়ে আনা যায়?

ব্যাপারটা নিয়ে একদিন আলোচনা হচ্ছিল—হঠাৎ বাবা বললেন, "ইচ্ছে মত জ্বর বাধাবার একটা উপায় আছে জানিস না?"

"সত্যি? কী ভাবে?"

"খুব সোজা। বগলে রসুন নিয়ে রোদে বসে থাকবি। দেখিস ঝাঁই ঝাঁই করে জ্বর উঠে যাবে!"

"শরীর খারাপ লাগবে না?"

"নাহ! শুধু জ্বর, কোন শরীর খারাপ না। পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করে নিবি আবার জ্বরে নেমে যাবে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

পরের দিনই ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা নেওয়া হল। স্কুলে যাবার সময় হয়েছে তখন আমাদের বড় ভাই খালি গায়ে তেল মেখে বের হয়েছে। মা তাকে রসুন দিয়েছেন সেই রসুন সে বগলে নিয়ে রোদে হাঁটা হাটি করছে। আমরা ভাই বোনেরা উৎসাহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একটু পরে পরেই সে আমাদের কাছে আসছে আমরা গায়ে হাত দিয়ে দেখছি জ্বর কতটুকু উঠেছে। বাবার অফিস খুব কাছে সেখান থেকে বাবাও মাথা বের করে খোঁজ নিচ্ছেন জ্বর কতটুকু উঠল। মা ও রান্না ফেলে বের হয়ে এসেছেন দেখার জন্যে। বাসায় মোটামুটি একটা উৎসবের পরিবেশ।

বাসার সামনেই স্কুল, সেই স্কুলে ঘন্টা পড়ে গেছে কিন্তু সেদিকে আজ কারো নজর নেই। জ্বর তোলার জন্যে বড় ভাই বগলে রসুন নিয়ে হাঁটছে সেই জ্বর উঠলে তাকে স্কুলে যেতে হবে না, ব্যাপারটা কেমন কাজ করে দেখার জন্যে আমরা সবাই বারান্দায় বসে আছি। বড় ভাই তাই প্রাণপনে রোদে হেঁটে বেড়াচ্ছে, বাবাও অফিসের দরজায় দাড়িয়ে আছেন, আশে পাশেও খবর চলে গেছে, আরো বাচ্চারাও চলে এসেছে। বাসায় থার্মোমিটার নেই। খোঁজ করে সেটাও জোগাড় করা হয়েছে জ্বর কতটুকু উঠল মাপতে হবে না?

একজনের জ্বর উঠলে সাধারণতঃ একজন স্কুল কামাই করে। সেদিন স্কুল কামাই করার জন্যে জ্বর তোলা ব্যাপারটি দেখার জন্যে সবার স্কুল কামাই হয়ে গেল!

বান্দরবন থেকে আমরা এসেছি চট্টগ্রামে। যে স্কুলে ভর্তি হয়েছি সেটার নাম পি. টি. স্কুল। খেলাধুলাকে পি, টি বলে, তাই ধারণা ছিল বুঝি এটা খেলাধুলার স্কুল কিন্তু দেখা গেল তার আসল নাম প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট। সব সময়েই আমাদের স্কুলটা হয় বাসার কাছাকাছি। এবারেও তাই রাস্তার একপাশে বাসা অন্য পাশে স্কুল, বাসার জানালা খুলে স্কুলের ভিতরে কি হচ্ছে দেখা যায়।

স্কুলে কয়দিন ক্লাশ করার পর যাকে ক্লাশ টীচার পেলাম তার নাম মালেক স্যার। স্কুলের মাষ্টার না হয়ে এই স্যার সহজেই মিলিটারীর হাবিলদার হতে পারতেন, শক্ত পেটা শরীর, মোটা ঘাড় গর্দান, ছোট এবং নিষ্ঠুর চোখ এবং থুতনীতে এক গোছা দাড়ি। স্কুলে এই স্যার শক্ত স্যার হিসেবে পরিচিত। যারা একবার তার মার খেয়েছে বাবার নাম না ভুলে গেলেও মামা-চাচার নাম সহজেই ভুলে গেছে।

এই স্কুলে এসে আমি নুতন কিছু সমস্যায় পড়লাম। ছোট থাকতে আমি যে রকম হাবাগোবা ছিলাম এখন আর ততটা হাবা গোবা নই, অল্প বিস্তর দুষ্টুমী করা শিখেছি এবং আবিষ্কার করেছি হাবাগোবা হয়ে থেকে কোন মজা নেই দুষ্টুমী করায় অনেক মজা। তবে দুষ্টুমী করলে সেই খবর মাঝে মাঝেই স্যারদের কাছে চলে যায় এবং তখন স্যাররা নানাভাবে তার শাস্তি দেন। আমার দুই নম্বর সমস্যা হচ্ছে বড় বোন শেফু সে আমার সাথে এক ক্লাশে পড়ে। কাজেই আমার যত অপকর্ম সে তার সবকিছুর চাক্ষুস সাক্ষী। বড় বোনেরা যে রকম ছোট ভাইদের জীবন অতিষ্ট করে দেয় সে অবশ্যি মোটেও সেরকম বড় বোন নয়, স্কুলে ক্লাশে আমি যত দুষ্কর্ম আর অপকর্ম করেছি সেটা নিয়ে আমাকে ছোট খাট ব্ল্যাক মেলিং করলেও কখনোই বাসায় রিপোর্ট করে নি। আট দশ বছরের বাচ্চার জন্যে সেটা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

আমি মোটামুটি নিরীহ এবং হাবাগোবা হিসেবে স্কুলে এসেছি। ক্লাশের এবং পাড়ার ছেলেরা আমাকে মানুষ করার কাজে লেগে গেল। অনেকেই ছিল মোটামুটি মাস্তান গোছের তারা আমাকে নানা রকম বিদ্যা শেখাতে শুধু করল। দেখতে শুনতে সবচেয়ে যে নিরীহ সে আমাকে শেখাল কিভাবে আনি ঘষে সেটাকে সিকি তৈরী করতে হয়। (আনি হচ্ছে এক আনা, ষোল আনায় হত এক টাকা, সিকি হচ্ছে চার আনা) যে পরিশ্রম করে আনিকে সিকি তৈরী করতে হয় তার চেয়ে অনেক কম পরিশ্রমে কয়েকটা সিকি উপার্জন করা যেতো। শুধু তাই নয় এই সিকি দোকান চালানো কঠিন ব্যপার ছিল আমাদের বয়সী কেউ সিকি নিয়ে গেলে দোকান সেটা দশবার উল্টে পাল্টে দেখত। সেই সিকি শেষ পর্যন্ত অন্ধ ফকিরকে ভিক্ষা দেয়া ছাড়া আর কোন কাজে আসত না, ইহকালে না হোক পরকালের তো একটা ব্যবস্থা হত!

বন্ধু বান্ধবদের সাথে সারা শহর টো টো করে ঘুরোঘুরি করা শিখে গেলাম। [illegible] একটা হোটেলে লিফট তৈরী হয়েছে সেই লিফটওয়ালার সাথে এক বন্ধুর পরিচয় হয়েছে সে আমাদেরকে নিয়ে একদিন লিফটে চড়িয়ে আনল। একটা লোকাল ট্রেনে রেলষ্টেশন থেকে পাহাড়তলী পর্যন্ত গিয়ে আবার হেঁটে হেঁটে ফিরে আসা যায় সেটাও একদিন পরীক্ষা করে দেখা হল। কাছাকাছি এক পশু হাসপাতালে বিশাল একটা কাঁচের বোতলে দুই মাথাওয়ালা গরুর বাচ্চা ওষুধে ডুবিয়ে রাখা আছে সেটাও দেখতে যাই। মোটামুটি জীবনে তখন নানা রকম আনন্দ। সব যে নির্দোষ আনন্দ তা নয়, কিন্তু আনন্দ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাইরে অনেক আনন্দ হলেও স্কুলের ভিতরে খুব বেশী আনন্দ হচ্ছিল না তার এক নম্বর কারণ হচ্ছে মালেক স্যার। মিলিটারীতে স্যার খুব সহজেই ভাল হাবিলদার হতে পারতেন সত্যি কিন্তু স্যার হিসেবে তিনি একেবারেই বেমানান। স্যারের অত্যাচারে আমাদের জীবন একেবারে ওষ্ঠাগত। যখন আমরা হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম তখন হঠাৎ একদিন একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে পুরো পরিবেশটা পাল্টে গেল। ঘটনাটা ঘটল এভাবে।

একদিন ক্লাশ হচ্ছে তার মাঝে হঠাৎ মালেক স্যার শেফুকে ডেকে নিচু গলায় বললেন, "হঠাৎ করে খুব টাকা পয়সার টানাটানিতে পড়ে গেছি, তোর মাকে গিয়ে বলতে পারবি দশটা টাকা ধার দিতে, বেতন পেয়েই দিয়ে দেব।"

বাসা একেবারে স্কুলের কাছে, শেফুকে ছুটি দেয়া হল শেফু এক দৌড়ে বাসায় এসে মায়ের কাছ থেকে দশ টাকা নিয়ে এসে মালেক স্যারকে দিল। যে সময়ের কথা বলছি তখন দশ টাকা বেশ অনেক টাকা—স্যার টাকা পেয়ে খুব খুশী হয়ে উঠলেন। ক্লাশে সেদিন মালেক স্যার শেফুর ওপর বিশেষ সদয় হয়ে রইলেন। কঠিন কঠিন প্রশ্নগুলি করলেন অন্য সবাইকে তাদের অকারণে নানাভাবে গালিগালাজ করলেন। শেফুকে সবচেয়ে সোজা প্রশ্নটা করলেন শুধু তাই না শেফু সেই প্রশ্ন উত্তর দেবার পর মুখে এমন একটা মধুর বিগলিত হাসি ফুটিয়ে রাখলেন যেন শেফুর থেকে বুদ্ধিমতি মেয়ের এখনো পৃথিবীতে জন্ম হয় নি।

এর কয়দিন পর দেখা গেল ক্লাশে মালেক স্যার খুব চিন্তান্বিত মুখে বসে আছেন—ক্লাশে মন নেই। স্যার নতুন বিয়ে করেছেন আমরা জানি, বউকে চিঠি লেখার জন্যে কাগজে আমরা ফুল লতাপাতা এঁকে দিই, ধরে নিলাম নূতন বউ নিয়ে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। স্যার খানিকক্ষন বসে থেকে সমস্যাটা বলেই দিলেন, "খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি মনটা ভাল নেই।"

আমরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি স্বপ্ন ?"

"হাতীর পায়ের তলায় দেখলাম পিষে ফেলছে"– স্যার মুখ কাল করে, মাথা নাড়লেন। "মনটা খুব খারাপ।"

আমি বললাম, "স্যার আমাদের বাসায় একটা বই আছে। বইটায় নাম খাবনামা। সেই বইয়ে সব স্বপ্নের অর্থ লেখা আছে।"

স্যারের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "সত্যি?"

"সত্যি স্যার।"

"নিয়ে আসতে পারবি বইটা?"

"পারব স্যার।"

" যা তাহলে, এক দৌড় দিয়ে নিয়ে আয়।"

আমি সাথে সাথে ক্লাশ থেকে বের হয় দৌড়ে এলাম বাসায়। স্বপ্নের অর্থ বলে দেয়া বই "খাবনামা" নিয়ে আবার দৌড়ে এলাম স্কুলে। বইটা দেখে ভারী খুশী হলেন মালেক স্যার। উল্টেপাল্টে দেখে মুখে হাসি ফুটে উঠল। সেদিন ক্লাশে আমার সাথে সারাক্ষণ মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন মালেক স্যার। তাই দেখে ক্লাশের অন্য সবাই হিংসায় জ্বলে পুড়ে গেল।

এরপর বেশ অনেকদিন কেটে গেছে। প্রথম যেরকম মধুর ব্যবহার করেছেন সেই মধুর ব্যবহার আর নেই। খুব ইচ্ছে করত স্যার আরও কিছু একটা চাইতেন বাসা থেকে এনে দিতাম। কিন্তু আর চাইছেন না। ঠিক তখন একদিন শেফুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল–এরকম বুদ্ধি শুধু তার মাথা থেকেই বের হতে পারে। সেদিন মালেক স্যারের ক্লাশে অনেক পড়া শেষ করে যাবার কথা সেটা ঠিক করে করা হয়নি, ক্লাশে বিপদ হবার আশংকা আছে। ক্লাশ শুরু হবার আগে দেখতে পেলাম শেফু মালেক স্যারের কাছে গিয়ে দাড়িয়েছে। স্যার চোখ পাকিয়ে বললেন, "কি হয়েছে?"

"একটা কথা ছিল।"

"কি কথা?'

"আম্মা বলেছেন আপনি যে দশ টাকা ধার নিয়েছেন সেই টাকাটা ফেরৎ দিতে।"

স্যারের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, খানিকক্ষণ আমতা আমতা করে বললেন, "আজকে তো টাকা আনি নি। বেতন পেলেই দিয়ে দেব।"

শেফু মুখ শক্ত করে বলল, "মনে করে দেবেন—স্যার। আম্মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।"

স্যার জোরে জোরে মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন, "অবশ্যি দেব মা। অবশ্যি দেব।"

ক্লাশের শুরুতে এই ছোট আলোচনাটা শেফুর জন্য ম্যাজিকের মত কাজ করল। ক্লাশের সবাইকে পড়া ধরলেন যারা পারল না তাদের মেরে পিটিয়ে ধমকে একেবারে বারটা বাজিয়ে ছেড়ে দিলেন—শুধু শেফুকে কিছু বললেন না। তার সাথে মধুর একটা ব্যবহার—তার দিকে তাকালেন হাসি হাসি মুখে, কথা বললেন মিষ্টি মিষ্টি করে!

ব্যাপারটা আমিও ধরে ফেললাম একদিন। দোয়া কুনুত মুখস্ত করে যাবার কথা অনেক চেষ্টা করেও কায়দা করা যায় নি। ক্লাশে শুরুর আগে মালেক স্যারের সাথে গিয়ে দেখা করলাম, বললাম, "স্যার একটা কথা ছিল।"

স্যার চোখ পাকিয়ে বললেন, "কি কথা?"

"কাল রাতে আম্মা একটা স্বপ্ন দেখেছেন। খুব খারাপ স্বপ্ন।"

আমি কি বলতে চাইছি মালেক স্যার হঠাৎ করে মনে হল আন্দাজ করতে পারলেন, তার চোখ মুখ থেকে কাঠিন্য সরে সেখানে একটা মধুর মধুর ভাব চলে এল। আমি মুখ শক্ত রেখেই বললাম, "আম্মা স্বপ্নে দেখেছেন একটা বড় মাছ তাকে ঠোকর দিচ্ছে।"

"বড় মাছ?"

"জ্বি স্যার। স্বপ্নটা দেখার পর থেকে আম্মা খুব দুশ্চিন্তার মাঝে আছেন। স্বপ্নটার মানে কি জানতে চাইছেন।"

স্যার ততক্ষণে মুখে বিগলিত একটা হাসি ফুটিয়ে তুললেন। আমি সেই হাসি উপেক্ষা করে বললাম, "আম্মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন আমি যেন স্বপ্নের বইটা আপনার কাছে থেকে নিয়ে যাই।"

স্যার মুখে মাখনের মত একটা হাসি ফুটিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আসলে কি হয়েছে জান বাবা? সেদিন আমার বড় শালা এসেছে বাসায়, বইটা সে নিয়ে গেছে তার বাসায়। আমি কালকেই নিয়ে আসব-"

আমি মুখে এমন একটা ভান করলাম যেন মস্ত একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। স্যারের সাথে এই ছোট বাক্যালাপটি কাজ হলো ম্যাজিকের মত। ক্লাশের সবাইকে দোয়া কুনুত জিজ্ঞেস করে বেদম প্রহার করা হল– আমি ছাড়া!

যতদিন পি, টি স্কুলে ছিলাম আমি আর শেফু মালেক স্যারকে দশটি টাকা এবং খাবনামা বইটির কথা বলে ব্ল্যাক মেইল করেছিলাম। শিক্ষকদের ব্লাক মেইল করার জন্য পরকালে নিশ্চয়ই খুব কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেটা করে ইহকালে এত বড় বড় শাস্তি থেকে উদ্ধার পেয়েছি যে মনে হয় কাজটি খুব ভুল করা হয় নি।

কোকাকোলা

যখন আমি ক্লাশ থ্রীতে পড়ি তখন একদিন খবরের কাগজ খুলে দেখি তার মাঝখানে আস্ত পৃষ্ঠা জুড়ে একটা বিজ্ঞাপন। কাগজে বিশাল একটা বোতলের ছবি তার উপরে বড় বড় লেখা "কোকাকোলা।" বিজ্ঞাপনটা দেখে জিনিসটা কি ঠিক বোঝা গেল না কিন্তু কয়েকদিনের মাঝে বন্ধুদের থেকে খোঁজ পেলাম যে এটা একটা খাবার জিনিস। বোতলের মাঝে কালচে রংয়ের এক ধরণের তরল পদার্থ থাকে এবং সেটা খেলে নাকি খানিক্ষণ পর একটা ঢেকুর ওঠে এবং তখন নাকি নাক মুখ আর কান দিয়ে আগুনের হলকার মত ঝাঁঝ বের হয়ে আসে। নাক মুখ আর কান দিয়ে ঝাঁঝ বের করার জন্যে কেন মানুষ খামোখা কালচে একটা তরল পদার্থ খাবে আমরা সেটা বুঝতে পারলাম না।

আরো কয়েকদিন পর কোকাকোলা সম্পর্কে আরও খোজ খবর এল। জিনিসটা নাকি একধরনের পানীয় এবং এটা খেতে খারাপ নয়। এক দুজন বন্ধু সেটা খেয়ে এসেছে এবং আমাদের কাছে তারা কোকাকোলার স্বাদ গন্ধ বর্ণ এবং বিশেষ করে তার ঝাঁঝালো ঢেকুরের একটা রোমহর্ষক বর্ণনা দিল। আমাদের মাঝে আবার একজন ছিল নামাজী। সে আমাদের সম্পূর্ণ নূতন খবর এনে দিল। সে জানাল যে তার কাছে পাকা খবর রয়েছে যে কোকাকোলায় নেশা করার জন্যে মদ মিশিয়ে দেয়া হয়। কাজেই কেউ যদি কোকাকোলা খায় তাকে সোজাসুজি দোজখে যেতে হবে। তার পরিচিত একজন নাকি তিন বোতল কোকাকোলা খেয়ে পুরোপুরি মাতাল হয়ে গিয়েছিল, লোকজন দেখেছে প্যান্ট খুলে মাথায় বেঁধে সে চৌরাস্তায় হাঁটাহাটি করছে।

কথাটা সত্যি না মিথ্যা সেটা নিয়ে ভীষণ উত্তেজনা। আমরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেলাম, একদল কোকাকোলার পক্ষে আরেকদল কোকাকোলার বিপক্ষে। দিনরাত আমরা কোকাকোলা নিয়ে আলোচনা করি। শহরে বড় বড় কোকাকোলার গাড়ি এসেছে, সেটা দিয়ে দোকানে দোকানে কোকাকোলা দেওয়া হচ্ছে। আমরা ঘুরে ঘুরে কোকাকোলার বোতল দেখে আসি। বোতল ক্যাপ দিয়ে সীল করা থাকে। বোতল খুলে সেগুলি ফেলে দেওয়া হয়। আমরা সেগুলি কুড়িয়ে এনে নানাকাজে ব্যবহার করি। একটা ক্যাপের সাথে রাবার ব্যান্ড, বোতাম আর গিট দেওয়া সূতো দিয়ে এক ধরনের যন্ত্র তৈরী করা যায়, সেটা টান দিলে ক্যাট ক্যাট করে শব্দ হয়। আমাদের সবার কাছে এরকম দুই চারটা যন্ত্র রয়েছে কর্কশ ক্যাট ক্যাট শব্দের কারণে কেউ আমাদের ধারে কাছে আসতে পারে না।

এর মাঝে আমাদের আরেক বন্ধু খবর আনল যে কোকাকোলা যদি বরফের মত ঠান্ডা করে খাওয়া যায় তাহলে নাকি একটু পরে পরে ঢেকুর উঠতে থাকে এবং সেই ঢেকুরের ঝাঁঝ হয় অনেক বেশী এবং মনে হতে থাকে নাক মুখ দিয়ে আগুন বের হয়ে আসছে। শুধুমাত্র যাদের বুকের পাটা অনেক বেশী তারাই যেন

গলফ ঠান্ডা কোকাকোলা খাওয়ার চেষ্টা করে কারণ ব্যাপারটা নাকি সাক্ষাৎ মৃত্যুর আলামত। কোকাকোলা সম্পর্কে আরো খবরাখবর আসে, এটা নাকি এসিডের মত যেটাকে স্পর্শ করে সেটা গলিয়ে ফেলে। একজন মুখে কোকাকোলা নিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিল সকালে উঠে দেখে সব দাঁত গলে গিয়েছে মুখে শুধু মাড়ি।

স্কুলের বাইরেও চারিদিকে শুধু কোকাকোলার গল্প। দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার, রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিশাল সাইনবোর্ড, এরকম একটা জিনিস ছাড়া আমরা কিভাবে এতদিন বেঁচে ছিলাম আমরা এখন চিন্তাও করতে পারি না।

এরকম সময়ে আমাদের ক্লাশে একদিন পরীক্ষা। পড়াশোনার ব্যাপারটা তখন আমার কাছে সহজ, পরীক্ষায় অন্যদের অনেক আগেই আমার লেখালেখি শেষ হয়ে যায়। সেদিনও তাই হল। সময় শেষ হবার অনেক আগেই আমার লেখালেখি শেষ, চুপচাপ খাতা নিয়ে বসে থেকে বিরক্ত হয়ে গেলাম। সময় কাটানোর জন্যে পরীক্ষায় খাতার সামনে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেখানে একটা বিশাল কোকাকোলার বোতলের ছবি আঁকলাম। বোতলে কোকাকোলা এবং তার মাঝে থেকে বুদবুদ বের হচ্ছে। অন্যপাশে একজন মানুষকে আঁকলাম, তার মুখে হাসি সে একটা কোকাকোলার বোতল নিয়ে ঢক ঢক করে খাচ্ছে। দুইটা ছবির মাঝখানে বড় বড় করে লিখলাম "কোকাকোলা পান করুন"। দরদ দিয়ে আকাঁ ছবি, ভারী চমৎকার হল দেখতে, আমার পাশে যে বসেছিল সেও আমার শিল্প- কর্ম দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে পরীক্ষার খাতা ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে। স্যারের খাতা দেওয়ার একটা নিয়ম আছে। প্রথমে ফেরৎ দেন সবচেয়ে বেশী যে নম্বর পেয়েছে তার খাতাটা, তারপর যে তার থেকে একটু কম, তারপর যে তার থেকে আরেকটু কম। সাধারণতঃ প্রথম দুই তিন জনের মাঝেই আমার খাতাটা থাকে কিন্তু এবারে ব্যতিক্রম ঘটল আমি প্রথম দু তিনজনের মাঝে খাতা ফেরৎ পেলাম না। পরীক্ষা যখন দিয়েছিলাম তখন মনে হয়েছিল পরীক্ষাটা ভালই দিয়েছি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই কিছু একটা ভুল করে ফেলেছি। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বসে রইলাম স্যার ভাল খাতা দেওয়া শেষ করে মাঝারী খাতা দেওয়া শুরু করলেন তারপর মাঝারী খাতা শেষ করে যারা ক্লাশে এসে উদাস মুখে বাইরে তাকিয়ে বসে থাকে তাদের খাতা দেওয়া শুরু করলেন কিন্তু তবু আমার খাতার দেখা নেই। পরীক্ষায় ফেল করে ফেলেছি এরকম তো হতে পারে না। কিছু একটা বড় গোলমাল হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; তবে গোলমালটা কোথায় হয়েছে কিছুতেই ধরতে পারলাম না। হঠাৎ করে ভয়ে আমার পেটের ভিতরে পাক খেতে শুরু করল।

সব খাতা ফেরৎ দেওয়া হয়েছে, স্যারের হাতে এখন একটি মাত্র খাতা এবং স্যার সেই খাতাটা ফেরৎ না দিয়ে হাতে ধরে রেখেছেন। স্যার হঠাৎ টেবিলে

থাবা দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "এখন তোদেরকে একটা জিনিস দেখাব, সবাই দেখ।"

স্যারের গলা শুনে সবাই সামনে তাকাল। স্যার তখন আমাকে ডাকলেন। আমি স্যারের দিকে এগিয়ে গেলাম, কাছাকাছি পৌছাতেই খপ করে আমার কানটা ধরে ফেললেন, তারপর সেটা ধরে রেখেই স্যার পরীক্ষার খাতাটা খুলে সারা ক্লাশকে দেখালেন পরীক্ষায় খাতার উপরে আমার বিশাল শিল্পকর্ম। কোকাকোলার বোতল এবং হাস্যমুখী একজন মানুষ এবং বড় বড় করে লেখা "কোকাকোলা পান করুন।" ছবিটি দেখে সারা ক্লাশে একটা বিস্ময়ধ্বনী উঠল আর স্যার আমার কান ধরে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে বললেন, "আমার সাথে মশকরা? কোকাকোলা পান করুন?"

ক্লাশের ছেলেরা এবারে খুব আনন্দ পেল, কেউ শাস্তি পেলে সাধারণতঃ আনন্দ হয় না কিন্তু এটি সম্পূর্ন ভিন্ন ব্যাপার , স্যার খুব রেগে যাওয়ার ভাণ করে আছেন কিন্তু আসলে যে বেশী রাগেন নি সেটা বুঝতে কারো বাকী নেই। ছেলেমেয়েরা হাত তালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল। স্যার আরেক বার কান টেনে হাতে খাতাটা দিয়ে বললেন, "নে, ভাগ"

একজন জিজ্ঞেস করল, "কত পেয়েছে স্যার?"

"পেয়েছে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু বেশী পেলেই কি মশকরা করবে নাকি? তাও পরীক্ষার খাতায়?"

এতদিন পর এখনো আমি বুঝতে পারি না যদি অন্য সব জায়গায় কোকাকোলার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় তাহলে পরীক্ষার খাতায় তার একটা বিজ্ঞাপন দিলে ক্ষতি কি?

কলম

বাবা অফিসের কাজে ঢাকা গেছেন, সেখান থেকে আমাদের চিঠি লিখেছেন সবুজ রংয়ের কালিতে। শুধু তাই না সেই সবুজ কালিতে লেখা চিঠিতে কলমের দাগ অসম্ভব মসৃন, কোথাও থেবড়ে যায় নি কোথাও সরু হয়ে যায় নি। এত রকম কালি থাকতে সবুজ রংয়ের কালিতে কেন লিখলেন আর কেমন করে তার লেখা এত মসৃন হল আমরা সেটা নিয়ে গবেষণা করতে থাকি। আব্বার সোনালী রংয়ের একটা পাইলট কলম আছে। লিখতে লিখতে সেটার নিব ক্ষয়ে গেছে, সেটা লেখা হয় অনেক মোটা। এই লেখা সেই কলম দিয়ে নয়, নিশ্চয়ই অন্য কলম কিনেছেন। আব্বার এত প্রিয় পাইলট কলম থাকতে কেন অন্য কলম কিনেছেন আর কেন সেই কলমে সবুজ কালি ভরে লিখছেন আমরা সেটা নিয়ে নানরকম গবেষণা করতে থাকি।

আমাদের গবেষণা শেষ হবার আগেই আব্বা ঢাকা থেকে ফিরে এলেন, সাথে নানারকম জিনিসপত্র এনেছেন কিন্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক হচ্ছে দুটি কলম। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তৈরী, ভিতরে একটা সরু টিউব সেখানে সবুজ রংয়ের কালি। কোন নিব নেই তার বদলে পেন্সিলের শীষের মত সূচাঁলো মাথা এবং কাগজে সেটা দিয়ে লিখলে যে অনুভূতি হয় সেটা খসখসে অনুভূতি নয় মাখনের মত নরম একটা অনুভূতি। শুধু তাই না, যদিও কলমের লেখা কিন্তু লেখামাত্র সেই লেখা শুকিয়ে যায়। হাত দিয়ে ঘষলে থেবড়ে যায় না। একটু লিখলে শুধু লিখতেই ইচ্ছে করে। আমরা নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, যখন বাবা আমাকে আর শেফুকে একটা করে কলম দিয়ে দিলেন।

উত্তেজনায় রাতে আমার ঘুম আসে না ,কখন সকাল হবে কখন স্কুলে গিয়ে সবাইকে দেখাব। পরদিন ভোরে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে স্কুলে রওনা দিয়েছি, বুক পকেটে আমার সেই বিখ্যাত কলম। ক্লাশে বই রেখে আমরা বাইরে এসে হাঁটাহাঁটি করছি, কলমটা দেখানোর জন্যে বুকটা উঁচু করে রেখেছি কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলছি না। হঠাৎ একজন কলমটা দেখে ফেলল, জিজ্ঞেস করল, "ওটা কি?"

আমি উদাস গলায় বললাম "কলম।"

"কলম? কি রকম কলম এটা?"

আমি গম্ভীর হয়ে কলমটা তার হাতে দিয়ে বললাম , "এই দেখ। সাবধানে ধরিস, ময়লা করিস না।"

আমার বন্ধুটি হাতে নিয়ে ছুঁয়ে দেখল তারপর কাগজে একটু লিখে অবিশ্বাসের গলায় চিৎকার করে উঠল,"কি সাংঘাতিক।"

কিছুক্ষণের মাঝেই সারা স্কুলে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে আমার কাছে একটা সাংঘাতিক কলম রয়েছে এবং একজন একজন করে সবাই সেই কলম দিয়ে একটু লিখতে আসছে। বেশী লিখে কেউ যেন কালি শেষ করে না ফেলে সেটা নিয়ে বার বার সতর্ক করে আমি তাদের হাতে কলমটা দিলাম আর সবাই কাগজে এক দুই লাইন লিখে দেখল।

ক্লাশ শুরু হবার পর ক্লাশ টীচারও কলমটার কথা শুনলেন, তিনিও একবার দেখতে চাইলেন। কাগজে সেটা দিয়ে এক লাইন লিখে স্যার একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। উত্তেজনায় বিজ্ঞান গবেষণা আর নূতন নূতন আবিষ্কারের উপর স্যার একটা বিশাল লেকচার দিয়ে ফেললেন। শুনে গর্বে আমার বুক দশ হাত ফুলে উঠল।

কলমটা ছিল একটা বল পয়েন্ট কলম।

গিনিপিগ

পি.টি. স্কুলে যে পড়শোনা করার একটা বিপদ আছে সেটা টের পেলাম কিছুদিন পরে। এই স্কুলে আমরা যে রকম পড়াশোনা করতে আসি ঠিক সেরকম নানা এলাকা থেকে স্কুলের মাষ্টাররাও পড়াশোনা করতে আসেন, তাদের বলা হয় ট্রেনিং মাষ্টার। ট্রেনিং মাষ্টারদের জন্যে আলাদা হোস্টেল, আলাদা খাবার জায়গা আছে তারা সেখানে থাকেন এবং খান এবং ঠিক আমাদের মত ক্লাশ করেন। বয়স্ক মানুষেরা ক্লাশ করছে ব্যাপারটা দেখে আমাদের ভারী মজা লাগত, পড়া না পারলে তাদের শাস্তি দেওয়া হয় কি না, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কি না, ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের খুব কৌতূহল ছিল। আমাদের বন্ধুদের মাঝে এই নিয়ে দুই ভাগ ছিল, এক ভাগ বলত যে হ্যাঁ তাদের শাস্তি দেওয়া হয়, অন্য ভাগ বলত যে না তাদের শাস্তি দেওয়া হয় না।

তবে তাদের আমাদের মত পরীক্ষা দিতে হত এবং পরীক্ষার পর ক্লাশরুমে গিয়ে আমরা তাদের নানরকম অপকর্মের চিহ্ন খুঁজে পেতাম।পরীক্ষায় তারা নকল করতেন এবং পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে আমরা ক্লাশঘরে ঢুকে গিয়ে তারা যে সব নকল আগে থেকে লুকিয়ে রেখেছেন সে গুলি খুঁজে খুঁজে বের করতাম। ছোট ছোট কাগজের টুকরার মাঝে গুটি গুটি করে তারা পুরো বই লিখে লুকিয়ে রাখতেন। শুধু আমরা যে দুষ্টু আর পাজী সেটা সত্যি নয়, যারা আমাদের দুষ্টু এবং পাজী বলে অপবাদ দেয় সেই বড়রা আমাদের থেকে ঢের বেশী পাজী ব্যাপারটা দেখে আমরা একটা অন্য রকমের আনন্দ পেতাম।

আমাদের স্কুলের ট্রেনিং মাষ্টারদের বছরের একটা সময়ে কোন একটা ছাত্রকে নিয়ে গবেষণা করতে হয়। সেই সময়টা ছিল ছাত্রদের জন্যে খুব বড় বিপদের সময়। তারা তখন একজন ছাত্রকে গবেষণার জন্যে বেছে নিত এবং সেই গিনিপিগ ছাত্রের জীবন তখন পুরোপুরি বরবাদ হয়ে যেতো। ব্যাপারটা আমি জানতাম না। কিন্তু আমার যারা বন্ধু ছিল তারা আমাকে সাবধান করে দিল।

একদিন স্কুল শেষে আমি আর শেফু বাসার দিকে যাচ্ছি হঠাৎ দেখতে পেলাম আমাদের পিছু পিছু একজন ট্রেনিং মাষ্টার আসছে। তার একহাতে নোট বই অন্য হাতে কলম এবং চোখে মুখে শিকার ধরার উত্তেজনা। একা থাকলে ছুটে পালিয়ে যাওয়া যেতো কিন্তু সাথে শেফুকে নিয়ে হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, আমি কি করব বুঝতে না পেরে এদিক সেদিক তাকাতে লাগালাম। ট্রেনিং মাষ্টার লম্বা পা ফেলে আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন,কাছে এসে আমার দিকে মধুরভাবে হেসে বললেন, "খোকা, তোমার নাম কি?"

আমি দ্রুত চিন্তা করতে থাকি সত্যি নামটা বললেই বিপদ। ঢোক গিলে বললাম, "আক্কাস আলি।"

শেফু আমার নাম শুনে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল, আমি তাকে কনুই দিয়ে একটা খোঁচা দিলাম। ট্রেনিং মাস্টার তার নোট বইয়ে আমার নামটা লিখে আবার মধুর ভঙ্গিতে হেসে বলল, "তুমি কোন ক্লাশে পড়, খোকা?"

আমি এক ক্লাশ কমিয়ে বললাম, "থ্রী।"

শেফু এবারে মুখ দিয়ে বিস্ময়ের একটা শব্দ করল, তখন আমি আবার তাকে কনুই দিয়ে একটা খোঁচা দিলাম। ট্রেনিং মাস্টার নোট বইয়ে লিখে আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার আব্বার নাম কি?"

আমি দ্রুত চিন্তা করে একটা নাম বের করে বললাম, "কাসেম আলি।"

এবারে শেফু আর সহ্য করতে পারল না, চোখ কপালে তুলে কনুই দিয়ে আমার পেটে গুতো মেরে বলল, "মিছা কথা বলিস কেন?"

আমি ধরা পড়ে গেলাম। যারা মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করে দেখেছে তারা জানে মিথ্যে কথা বলা অসম্ভব কঠিন। একবার ধরা পড়ে গেলে সেটা হয় আরো অনেক বেশি কঠিন। আমার আর কোন উপায় রইল না। সব কিছু খুলে বলতে হল । ট্রেনিং মাস্টার তার নোট বইয়ে আমার নাম ঠিকানা পরিচয় লিখে নিয়ে আমাকে তার গবেষণার বিষয়বস্তু– একটি গিনিপিগে পাল্টে দিল।

এরপর আমার জীবনে একটা ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে এল, আমি যেখানেই যাই আমার পিছনে পিছনে সেই ট্রেনিং মাস্টার শনিগ্রহের মত লেগে রইলেন। হয়তো ক্লাশ শুরু হওয়ার আগে খেলছি হঠাৎ সেই ট্রেনিং মাস্টার খেলা থেকে আমাকে ধরে নিয়ে এলেন। তার হাতে একটা নোট বই এবং কলম, আমার দিকে ভুরু কুচকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজকে সকালে কি খেয়েছ?"

আমি প্রাণপনে মনে করার চেষ্টা করে বললাম, "খিচুড়ি।"

ট্রেনিং মাস্টার সেটা তার নোট বইয়ে লিখে ফেলে বললেন, "সাথে কি ছিল?"

"ডিম ভাজা।"

সেটা লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁসের ডিম না মুরগীর ডিম?"

আমি মাথা চুলকে বললাম "জানি না।"

"জান না?"

"না।"

তিনি ভুরু কুচকে আমার দিকে খানিকক্ষন তাকিয়ে রইলেন, যেন আমি খুব বড় একটা অন্যায় করে ফেলেছি। তারপর তার নোট বইয়ে খসখস করে অনেক কিছু লিখে ফেললেন।

হয়তো টিফিন ছুটিতে সবাই মিলে "কিং -কুইন" খেলছি হঠাৎ দেখতে পেলাম ট্রেনিং মাস্টার আমার দিকে এগিয়ে আসছে, আমি কিছু করার আগেই খপ করে আমার হাত ধরে ফেললেন, বললেন, "তোমার হাত দেখি।"

আমি হাত দেখালাম, এক নজর দেখেই তিনি চমকে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! তোমার নখ এত বড় কেন? নখের নিচে ময়লা?"

আমি আমার নখের দিকে তাকালাম। সেটা এমন কিছু বড় নয়। খামচাখামচি করার জন্যে এইটুকু বড় রাখতেই হয়। আর নখের নিচে যদি ময়লা না থাকে সেটা তাহলে থাকবে কোথায়? চোখের নিচে? এটা আবার কি রকম প্রশ্ন?

ট্রেনিং মাস্টার তখন তখনি জং ধরা অর্ধেকটা ব্লেড নিয়ে এসে সেটা দিয়ে আমার নখ কাটতে বসলেন। যখন সব বন্ধুরা মিলে মাঠে ছুটিয়ে কিং কুইন খেলছে তখন আমি বসে আছি বারান্দায় এবং সেখানে ট্রেনিং মাস্টার উবু হয়ে বসে আমার নখ কাটতে কাটতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং রোগ শোক আর জীবাণুর উপরে বক্তৃতা দিচ্ছেন। আমার জীবনের উপরে বিতৃষ্ণা এসে গেল।

শুধু তাই না যখন আমি যখন যেখানেই যাই না কেন দেখি ট্রেনিং মাস্টার তার নোট বই হাতে আমার পিছু পিছু যাচ্ছে এবং আমার দিকে চোখ পড়তেই খসখস করে খাতায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে ফেলছে। ট্রেনিং মাস্টার একদিন বাজারের কাছাকাছি আমাকে ধরে ফেলে বললেন, "কোথায় যাও?"

আমি অনির্দিষ্টের মত বললাম "ঐ তো ঐ দিকে।"

"তোমার পায়ে জুতো নেই কেন?"

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম, আমার কি মাথা খারাপ যে জুতো পরে ঘোরাঘুরি করব?

"তুমি জান না রাস্তাঘাটে কত রকম কাটা লোহা-লক্কড় থাকে? হুক ওয়ার্মের জীবাণু থাকে। জং ধরা লোহা দিয়ে কেটে গেলে ধনুষ্টংকার হতে পারে তুমি জান?"

আমি মাথা নাড়লাম, "জানি।"

"তাহলে?"

বড় মানুষদের নির্বুদ্ধিতা দেখে আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম আর সাথে সাথে ট্রেনিং মাস্টার তার নোট বইয়ে খসখস করে অনেক কিছু লিখে ফেললেন।

আমার উপর গবেষণা করে আমার ট্রেনিং মাস্টার যে রিপোর্টটি দিয়েছিলেন সেটাতে তিনি কত নম্বর পেয়েছিলেন কে জানে। কিন্তু আমি একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আমার বা আমার বয়সী বাচ্চাদের যে চমৎকার একটা জগৎ থাকে আমার ট্রেনিং মাস্টার কখনো সেই জগতে উঁকি দিয়ে দেখতে পারেন নি। যদি সত্যি সেই জগতে উঁকি দিয়ে সত্যিকারের একটা রিপোর্ট লিখতে পারতেন, আমি বাজি ধরে বলতে পারি তাহলে তারা পরীক্ষায় ফেল করে যেতেন।

বড় মানুষেরা ছোটদের সম্পর্কে একেবারে কিছুই জানে না!

ব্যাঙের ছাতা

ট্রেনিং মাস্টার আমার জীবন মোটামুটি অতিষ্ট করে দিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু দীর্ঘদিন আমার উপর গবেষণা করে করে তার বোধ হয় আমার উপরে খানিকটা মায়া জন্মে গিয়েছিল। মায়া একটা খুব বিচিত্র জিনিস সেটা সবসময়ে প্রকাশ পেয়ে যায় আর সেটা যত বড় উৎপাতই হোক না কেন কী ভাবে কী ভাবে জানি দুদিক দিয়েই গড়ে উঠে। তাই যেদিন ট্রেনিং মাস্টারদের ফাইনাল পরীক্ষার সময় হল আর তিনি মুখ কাচুমাচু করে আমাকে জানালেন পরীক্ষার দিন তাঁর আমাদের ক্লাশকে পড়াতে হবে। আমার তাঁর জন্যে একটু মায়া হল। ট্রেনিং মাস্টার খুব দুশ্চিন্তিত ভাবে বললেন, "তোমাদের ক্লাশে খুব পাজী পাজী ছেলেরা আছে, যদি একটু গোলমাল করে তাহলেই আমি ফেল।"

আমি তাকে অভয় দিলাম, "কেউ গোলমাল করবে না, স্যার।"

"বাইরে থেকে সব লোকজন আসবে, ক্লাশের পিছনে বসে থাকবে, দেখবে আমি কেমন করে পড়াই।"

আমি সাহস দিলাম, "কোন ভয় নাই স্যার।"

"যদি আমি তোমাদের পড়া জিজ্ঞেস করি আর তোমরা পড়া না পার তাহলে কিন্তু আমি সাথে সাথে ফেল।"

"আমরা সবাই পড়া মুখস্ত করে আসব। কোনটা পড়াবেন স্যার?

"তোমাদের বইয়ে একটা 'ব্যাঙের ছাতা' নামে গল্প আছে না, সেটা।"

ব্যাঙের ছাতা লেখাটা আসলে মোটেই সুবিধের না কিন্তু আমি আর তাঁকে কিছু বললাম না। ট্রেনিং মাষ্টার খানিকক্ষন চুপ করে থেকে বললেন, "আমি যখন ক্লাশে পড়াব তখন সত্যিকারের ব্যাঙের ছাতা দেখাতে হবে।"

"কেন স্যার।"

"পড়ানোর সময় দেখানোর কথা। তাহলে ছাত্রদের উৎসাহ বাড়ে। যখন যে বিষয়ে পড়ানো হয় সেটা হাতে কলমে দেখাতে হয়।"

"কিন্তু কেউ তো কখনো দেখায় না।"

"আলসেমী করে দেখায়া না । কিন্তু পরীক্ষার সময় তো আলসেমী করা যায় না। দেখাতেই হবে।"

"ব্যাঙের ছাতা পেয়েছেন, স্যার?"

"এখনো পাই নাই।" ট্রেনিং মাস্টার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, " আমি তো খুব ব্যস্ত খোঁজাখুজির সময় পাই না, তুমি খুঁজে বের করতে পারবে না?"

আমি মাথা নাড়লাম, "পারব স্যার।"

"দেখো, খুব জরুরী ব্যাপার কিন্তু, ব্যাঙের ছাতা যদি খুঁজে না পাও, মহাবিপদ হয়ে যাবে আমার।"

"আপনি চিন্তা করবেন না স্যার, আমি খুঁজে বের করব।"

আমার জীবনে সেটা ছিল প্রথম একটা সত্যিকারের দায়িত্ব। ট্রেনিং মাস্টার পরিষ্কার বলে দিয়েছেন আমি যদি ব্যাঙের ছাতা খুঁজে না পাই তার মহাবিপদ হয়ে যাবে। আমার উপরে নির্ভর করছে তার জীবন মরণ। হঠাৎ করে আমার নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে থাকে।

আমি পরের দিন থেকে ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে শুরু করলাম। হাঁটাহাটি ঘুরোঘুরির সময় পথেঘাটে মাঠে বাসার পাশে অহরহ ব্যাঙের ছাতা দেখে আসছি কিন্তু যেই তাঁদের খোঁজা শুরু করলাম হঠাৎ ম্যাজিকের মত সব ব্যাঙের ছাতা উধাও হয়ে গেল। কোথাও আর ব্যাঙের ছাতা খুঁজে পাই না। বন্ধু বান্ধব পরিচিত লোকজন যে যেখানে আছে সবাইকে বলে রেখেছি ব্যাঙের ছাতা দেখলেই যেন আমাকে খবর দেয়; কিন্তু কেউ আর ব্যাঙের ছাতা দেখতে পায় না। এদিকে দিন কেটে যাচ্ছে ট্রেনিং মাস্টারের যত দুশ্চিন্তা আমার দুশ্চিন্তা তার থেকে দশগুণ বেশী। আমি স্কুল থেকে এসে মুখে দুই চারটে ভাত গুজেই বের হয়ে যাই, রাস্তায় রাস্তায় মাঠে ঘাটে খুজঁতে থাকি কিন্তু ব্যাঙের ছাতার আর খোঁজ পাওয়া যায় না।

একজন আমাকে বলল গোবরে নাকি ব্যাঙের ছাতা হয়, শুনে তখন তখনই আমি একজনের বাসায় হাজির হলাম তারা বাসায় গরু রাখে বাসায় কাজের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, আজ সকালেই নাকি এত বড় একটা ব্যাঙের ছাতা বের হয়েছিল সে পা দিয়ে পিষে ফেলেছে। শুনে মনে হল কেউ আমার হৃদপিন্ডটা পিষে ফেলেছে! ছেলেটা আমাকে বলল পুকুড় পাড়ে খোজাঁখুজি করতে। আমি খুঁজে খুঁজে একটা পুকুর পাড়ে হাজির হলাম। হেটে হেঁটে পুরো পুকুর পাড় চষে ফেললাম কিন্তু কোন ব্যাঙের ছাতার হদিস নেই। তখন একজন আমাকে বলল অন্ধকার স্যাঁতস্যাতে জায়গায় খুঁজতে। আমি তখন বাসার পিছনে গলি ঘুজিতে যত অন্ধকার স্যাঁতস্যাতে জায়গা আছে সব জায়গায় ব্যাঙের ছাতা খুজঁতে লাগলাম। আমার সব বন্ধুরা যখন হৈ চৈ করে খেলাধূলা করছে, আনন্দ স্ফূর্তি করছে আমি তখন পুকুর ঘাটে, গোবরতলায় অন্ধকার স্যাঁতস্যাতে জায়গায়, গলিঘুজিতে মাঠে ঘাটে ব্যাঙের ছাতা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার খাবারে রুচি নেই, কাজকর্মে আগ্রহ নেই, রাতে ঘুম নেই, দিনে স্বস্তি নেই পাগলের মত শুধু ব্যাঙের ছাতা খুঁজে বেড়াচ্ছি। যখনই আমি হাঁটি আমার চোখ লেগে থাকে মাটিতে ব্যাঙের ছাতার খোঁজে।

নির্দিষ্ট দিনের দুদিন আগের ঘটনা, সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব জায়গা খুঁজে খুঁজে কিছু না পেয়ে আমি বিকাল বেলা উদাস ভাবে স্কুলের মাঠে হাঁটছি। ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে খুঁজতে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটা অভ্যাস হয়ে গেছে, সেভাবেই হাঁটছি। মনটা ভাল নেই, প্রথম একটা এত বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছিলাম মনে হচ্ছে দায়িত্বটা বুঝি পালন করতে পারলাম না। হাটঁতে হাটঁতে আমি হঠাৎ করে একেবারে পাথরের মত জমে গেলাম, স্কুলের মাঠে আমার সামনে দুইফুট বাই

চারফুট চতুষ্কোন একটা জায়গায় খুব কম করে হলেও কয়েকশ ব্যাঙের ছাতা উঠেছে। কোনটা ছোট এবং কচি কোনটা মোটা এবং পুরুষ্টু। কোনটা ধবধবে সাদা, কোনটা হালকা হলুদ আবার কোনটার উপরে চিতির মত দাগ। কোনটা গোল বলের মত কোনটা থালার মত। আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, সত্যি দেখছি নাকি চোখের ভুল? ইচ্ছে হল আনন্দে একটা চিৎকার করে নেচে কুদে বেড়াই, মটিতে গড়াগড়ি খেয়ে ডিগবাজী দিই। আমি অবশ্যি তার কিছুই করলাম না, ব্যাঙের ছাতাগুলি এক পলক দেখে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছুটতে লাগলাম আমার ট্রেনিং মাস্টারের কাছে, তাকে এখনই এনে দেখাতে হবে এই বিশাল ব্যাঙের ছাতার বাগান!

ট্রেনিং মাস্টার মনে হল আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন, আমাকে দেখে বললেন, "তোমাকে খুঁজছিলাম।"

আমি দৌড়ে এসেছি বলে তখনো হাপাচ্ছি। নিঃশ্বাস নিয়ে ব্যাঙের ছাতার কথা বলতে যাব তখন ট্রেনিং মাষ্টার বললেন, "আমি কী ঠিক করেছি জান?"

"কী?"

"ব্যাঙের ছাতা লেখাটা বেশী মজার লেখা না। ওটা পড়াব না। তার বদলে সুন্দরবনে বাঘ শিকারটা পড়াব। একজন আর্টিস্টকে দিয়ে বাঘ শিকারের ছবি আঁকিয়ে এনেছি। সুন্দর ছবি হয়েছে।"

আমি ট্রেনিং মাস্টারের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলাম। ট্রেনিং মাষ্টার বললেন, "কি মনে হয় তোমার, বাঘ শিকারের গল্পটা ভাল হবে না?"

আমি খানিকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "ভাল হবে।

মজার ব্যাপার হল এতদিন পরেও পথেঘাটে হাঁটাহাটি করতে করতে হঠাৎ করে আমি যদি কোথাও ব্যাঙের ছাতা দেখি আনন্দে আমার বুকের মাঝে রক্ত ছলাৎ করে উঠে।

ব্যায়াম পরীক্ষা

একদিন স্কুলে গিয়ে দেখি ট্রেনিং মাস্টারদের পরীক্ষা শুরু হয়েছে, সেদিন তাদের খেলাধূলার পরীক্ষা, সবাই ছোট হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে বসে আছে। বুকে এবং পিঠে বড় কাগজে রোল নম্বর লেখা। পরিচিত এবং বয়স্ক মানুষদের হঠাৎ করে হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জী পরে বসে থাকতে দেখলে ভারী মজা লাগে। আমরা সবাই মজা দেখতে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের মাঝে একজন বলল, "ঐ যে আমার ট্রেনিং স্যার, এক নম্বর প্লেয়ার, দেখিস সবচেয়ে ভাল করবে।"

আমাকে যে রকম একজন ট্রেনিং মাস্টার গিনিপিগ হিসেবে বেছে নিয়েছে সেরকম আরো কয়েকজনকে অন্যান্য ট্রেনিং মাস্টাররা বেছে নিয়েছে। তারা সবাই তখন দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের ট্রেনিং মাস্টারের খুজে বের করে ফেলল, সবাই মনে মনে আশা করতে লাগল তাদের ট্রেনিং স্যারেরা সবচেয়ে ভাল করবে।

আমার ট্রেনিং স্যারকে খুঁজে বের করতে আমার কোন অসুবিধ হল না, তাকে কখনোই খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হয় না কারণ তিনি ছিলেন অসম্ভব মোটা। শুধুমাত্র কার্টুন সিনেমাতে এরকম মোটা মানুষ দেখা যায়। সত্যি সত্যি কেউ যে এত মোটা হতে পারে নিজের চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। তার হাত পা ছিল পিলারের মত, বিশাল জালার মত ছিল পেট, ঘাড় এবং গলা আলাদাভাবে দেখা যেতো না, দূর থেকে তাকে দেখতে একটা ছোট খাট পাহাড়ের মত। আমার এই ট্রেনিং মাষ্টার কোথাও বসলে সহজে উঠতে পারতেন না, রীতিমত কসরত করে তাকে উঠতে হত। আমার সব বন্ধু বান্ধবেরা যখন নিজেদের ট্রেনিং মাস্টারদের নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা করছে তখন আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। শারীরিক কসরতের এই পরীক্ষায় তার ভাল করা দূরে থাকুক পাশ করারই কোন সম্ভাবনা নেই।

যথাসময়ে পরীক্ষা শুরু হল। ড্রিল স্যার বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে সবাইকে একটা জিগবাজী দিতে বললেন, উপস্থিত প্রায় শ খানেক ট্রেনিং মাস্টার ডিগবাজী দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন শুধুমাত্র আমার ট্রেনিং স্যার তার জায়গাতে বসে থেকে মাথাটাকে একটু নোয়ানোর চেষ্টা করে হলে ছেড়ে দিয়ে ড্রীল স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পারব না স্যার।"

ড্রীল স্যার আবার বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে বললেন, "উল্টো ডিগবাজী।" সাথে সাথে সবাই উল্টো ডিগবাজী দিয়ে নিজের জায়াগায় ফিরে এল শুধুমাত্র আমার ট্রেনিং মাষ্টার নিজের জায়াগাতে বসে থেকেই ঘাড়টা একটু নেড়ে বললেন, "পারব না স্যার।"

আবার বাঁশীতে ফুঁ, এবারে বুকডন।

সবাই বুকডন দিল এবং আমার ট্রেনিং মাষ্টার বললেন, "পারব না স্যার।"
বাঁশীতে ফুঁ এবং মাটিতে শুয়ে দুই পা উপরে।
আমার ট্রেনিং মাষ্টার "পারব না স্যার।"
বাঁশীতে ফুঁ এবং মাটিতে বসে পায়ের আঙ্গুল ছোয়া।
আমার ট্রেনিং মাষ্টার "পারব না স্যার।"
বাঁশীতে ফুঁ এবং লাফিয়ে লাফিয়ে হাত তালি।
আমার ট্রেনিং মাষ্টার ঃ "পারব না স্যার।"

এইভাবে বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে একটার পর একটার পর একটা শারীরিক কসরত হতে লাগল এবং প্রত্যেকবারই আমার ট্রেনিং মাষ্টার একই জায়াগায় বসে থেকে মাথা নেড়ে নেড়ে মুখ কাচু মাচু করে বললেন, "পারব না স্যার!"

খুব সুন্দরভাবে "পারব না স্যার" বলার জন্য জন্যে নিশ্চয়ই আমার ট্রেনিং মাষ্টারকে পাশ করিয়ে দেয়া হয়েছিল কারণ চলে যাবার আগে আমাদের বাসায় তিনি দেখা করতে এসেছিলেন, কোন স্কুলে তিনি নাকি হেড মাষ্টারের চাকরী পেয়েছেন।

সবসময় ছাত্রদের উপর ভার থাকে তাদের শিক্ষকদের সম্মান রক্ষা করার, একবারই আমাদের শিক্ষকের উপর আমাদের সম্মান রক্ষা করার ভার পড়েছিল কিন্তু আমার টেনিং মাষ্টার আমার বন্ধু বান্ধবের সামনে যেভাবে আমার সম্মান ডুবিয়েছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে মনে হয় তার নজীর নেই!

হেঁচকি

বিকেল বেলা স্কুলের মাঠে খেলে বাসায় ফিরে যাচ্ছি হঠাৎ আমার হেঁচকি উঠতে শুরু করল। হেঁচকি খুব বিচিত্র জিনিস, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ করে শুরু হয়ে যায়, পেটের ভিতরে কোন একটা জায়গা থেকে অদৃশ্য কোন একটা জিনিস "হিক" শব্দ করে একটু পর পর বের হয়ে আসে। আমি হেঁচকি তুলতে তুলতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার স্যারের সাথে দেখা, আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। আমি হেঁচকি তুলতে তুলতে স্যারকে সালাম দিলাম, স্যার সালাম নিয়ে বললেন, "কোথায় যাস?"

"বাসায় যাই স্যার।"

স্যার মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ বাসাতে যাওয়াই ভাল।"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম,"কেন স্যার?"

স্যার অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, "তুই এখনো জানিস না?"

"না স্যার। কি হয়েছে?"

স্যার কঠিন মুখে বললেন, "তুই স্কুলে আজ কি করেছিস?"

স্কুলে আমি অনেক কিছু করি। স্যার কোনটার কথা বলছেন আমি আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। আমি কিছু বলার আগেই স্যার বললেন, "কাজটা ভাল হয় নাই।"

আমার মুখ শুকিয়ে গেল, আমতা আমতা করে বললাম, " কোন কাজটা স্যার?"

স্যার গম্ভীর হয়ে বললেন, " সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যারের কাছে নালিশ এসেছে, সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার খুব রেগে গেছেন। আমি ছিলাম তখন- আমার সামনেই হল পুরো ব্যাপারটা।"

"কি ব্যাপারটা?"

"তোর আব্বার কাছে লিখিত নোটিশ যাবে।"

"লিখিত নোটিশ?"

"হ্যাঁ।"স্যার চোখ ছোট ছোট করে বললেন", "এতক্ষণে মনে হয় দপ্তরী দিয়ে তোর বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

" পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ বাসায় গেলেই জানবি।" কালকে মনে হয় স্কুলে তোকে বেত মারা হবে।"

"বেত মারা হবে?"

"হ্যাঁ।" স্যার চোখ মুখে একটা হতাশার ভাব এনে বললেন, "দপ্তরীকে দেখলাম বেতগুলিতে তেল লাগাচ্ছে।"

আমি রক্তশূন্য মুখে স্যারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভয়ে আতংকে আমার পেটের মাঝে কি একটা যেন পাক খেতে থাকে। মনে হল আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। পায়ে আর জোর পাচ্ছি না মনে হচ্ছে এখন হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যাব। ছোটখাট দুষ্টুমী যে করি না তা নয়, কিন্তু তার মাঝে কোনটা এভাবে বিপদ ডেকে আনল? ঠিক কি করেছি সেটাও বুঝতে পারছি না, কিন্তু কিছু একটা করেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কি হবে চিন্তা করে আমার মেরুদন্ড দিয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত বইতে লাগল।

স্যার আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল, হাসতে হাসতেই বললেন, "কি রে? তোর হেঁচকি কোথায় গেল?"

আমি লক্ষ্য করলাম বেশ কিছুক্ষণ থেকে আমার হেঁচকি আসছে না, কিন্তু এই মহা বিপদের মাঝে তুচ্ছ হেঁচকি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায়? আমি স্যারকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলাম। স্যার আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, "আমি তোকে মিছিমিছি একটু ভয় দেখালাম। ভয় দেখালে হেঁচকি বন্ধ হয়ে যায়।"

আমি প্রথমে স্যারের কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমতা আমতা করে বললাম, " মি-মিছিমিছি?"

"হ্যাঁ। মিছিমিছি।"

"তার মানে আমি কিছু করি নাই?"

"না।"

"লিখিত নোটিশ যাবে না।"

"না।"

"দপ্তরী বেতে তেল মাখাচ্ছে না?"

স্যার চোখ বড় বড় করে বললেন, "সেটা মাখাতে পারে, তবে তোর জন্যে মাখাচ্ছে না।"

আমি আনন্দে চিৎকার করতে করতে বাসায় ছুটতে লাগলাম- কোন রকম হেঁচকি ছাড়াই!

জুতো

ক্লাশ ফাইভে আমরা বৃত্তি পরীক্ষা দেব। বৃত্তি পরীক্ষার সীট পড়েছে পাশের কলেজিয়েট হাই স্কুলে। আগে থেকে বলা হয়েছে আমরা সবাই প্রথমে নিজেদের স্কুলে আসব সেখান থেকে আমাদেরকে পাশের স্কুলে নিয়ে যাওয়া হবে।

বৃত্তি পরীক্ষা আমাদের জীবনের প্রথম একটা বড় পরীক্ষা, যেখানে আশেপাশের এলাকা থেকে সব স্কুলের ছেলেমেয়েরা আসবে, পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে এডমিট কার্ড দেওয়া হবে, ছাপানো প্রশ্ন দেওয়া হবে, এক সাথে সবাই পরীক্ষা দেবে। সবকিছু চিন্তা করে আমাদের বুক অনেকদিন থেকেই ধুক ধুক করছে। যেদিন পরীক্ষা সেদিন খুব সকাল সকাল আমরা পরিষ্কার জামা কাপড় জুতো পরে স্কুলে এসে হাজির হয়েছি। আমার নানা পরীক্ষা ভাল করার জন্যে একটা তাবিজ দিয়েছেন, সেটা টুপির মাঝে রেখে সেই টুপিটা মাথায় পরতে হয়। হাফ প্যান্টের সাথে টুপি পরলে কেমন জানি বোকাবোকা দেখায় তাই তাবিজটা আছে পকেটে। নিয়ম মাফিক করা হয়নি বলে তাবিজের তেজ যে কমে যাবে সেটা নিয়ে মনের মাঝে একটু দুশ্চিন্তা।

কিছুক্ষণের মাঝেই অন্য সব ছাত্রছাত্রীরাও চলে এল। আমি যেরকম ইস্ত্রি করা কাপড় পরে জুতো পায়ে এসেছি অন্যেরাও সে রকম। গলার কাছে মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করা সার্টের কলার খসখস করছে। পা মনে হচ্ছে জুতোর মাঝে বন্দী হয়ে আছে। সবার পকেটেই দুই তিনটা করে কলম। কলম পকেটে রেখে অভ্যাস নেই বলে কালি চুইয়ে এর মাঝেই অনেকের পকেটে কালির থ্যাবড়া তৈরী হয়ে গেছে।

যখন সবাই একত্র হয়েছি তখন আমাদের স্যার নানারকম উপদেশ দিয়ে আমাদের নিয়ে পাশের কলেজিয়েট স্কুলে রওনা দিলেন। আমাদের সাথে কয়েকজন ছেলের বাবাও আছেন- তারাও আমাদের সাথে যাচ্ছেন। একজন বললেন, "ভাল করে পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে ব্রেইনটাকে ঠান্ডা রাখতে হয়। তোমরা সবাই তোমাদের ব্রেইনটাকে ঠান্ডা রেখো।"

আমরা মাথা নাড়লাম। বন্ধুর বাবা আবার বললেন, "ব্রেইন ঠান্ডা রাখতে হলে সবসময় ব্রেইনে ব্লাড সার্কুলেশান বাড়াতে হয়। সে জন্যে ঢিলে ঢালা কাপড় পরতে হয়। সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে পা। পা থেকেই ব্লাড সার্কুলেশান শুরু হয়। পরীক্ষার সময় জুতো পরা ঠিক না।"

আমরা কোন কথা না বলে হেঁটে যেতে থাকলাম। আজকে আমাদের সবার পায়েই জুতো- একজন ছাড়া। যার পায়ে জুতো নেই তার বাবাই জুতোর অপকারিতা নিয়ে বলছেন। তার ছেলে যেন মনে কষ্ট না পায়।

মজার ব্যাপার হল আমরা কেউ কিন্তু খেয়াল করি নি আমাদের ঐ বন্ধুটি আজকেও খালি পায়ে এসেছে, বাবা যখন ব্লাড সার্কুলেশান আর জুতোর অপকারিতা নিয়ে বক্তৃতা দিলেন তখন সবার খেয়াল হল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম আমরা সব সময় খালি পায়ে ছোটাছুটি করি কারণ জুতো পরতে ভাল লাগে না। কিন্তু আমাদের সবারই জুতো আছে এই বন্ধুটির জুতো নেই। বন্ধুর বাবা তার ছেলেকে লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যে আজকে সত্যি সত্যি তাকে লজ্জার মাঝে ফেলে দিল। আমরা অবশ্যি ভান করলাম ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি নি। মাথা নেড়ে নেড়ে বন্ধুর বাবার কথা মেনে নিলাম।

ছোট থাকতেই সবকিছু আমরা বুঝতাম কিন্তু সব সময় ভান করতাম যে বুঝি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমার মনে হয় পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে সুন্দর গান হচ্ছে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" আমি যতবার এই গানটা শুনি ততবার আমার উনিশ শ একাত্তর সনের কথা মনে পড়ে যায়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা মনে পড়ে যায়। আর সেই যুদ্ধে আমার যারা প্রিয়জন মারা গেছে তাদের কথা মনে পড়ে যায় আর আমার চোখ ভিজে আসে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে দেখেছে এই গানটি শুনলে তাদের সবার বুকের মাঝে একধরণের ভালবাসার বান ডেকে যায়। পৃথিবীতে এর থেকে মধুর জাতীয় সংগীত আর কোথাও নেই।

আগে এরকম ছিল না। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেশটার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। দেশটার জাতীয় সংগীত ছিল "পাক সার জমীন শদ বাদ-" এর মানে কি আমরা কেউ জানতাম না। যে ভাষা বোঝা যায় না সেই ভাষায় জাতীয় সংগীত এর থেকে আজব ব্যাপার আর কী হতে পারে? কিন্তু সেটাই ছিল অবস্থা। শুধু যে অর্থ তাই নয় সেই গানের সুরও কেউ জানত না। যার যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে গান গাইত। কেউ গাইতো পল্লীগীতির সুরে, কেউ গাইতো রবীন্দ্র সংগীতের সুরে। খুব বিতিকিচ্ছি একটা ব্যাপার ঘটত আর আমরা সবাই ভাবতাম এটাই বুঝি জাতীয় সংগীতের নিয়ম। কিন্তু সেটা নিয়ম না, তাই হঠাৎ একদিন আমাদের স্কুলে কিছু লোক এসে হাজির। একজন শুকনো দড়ির মত মানুষ, মাথায় চকচকে টাক, গাল ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে গেছে, মুখে বড় বড় বেমানান গোঁফ। সাথে আরেক জন নাদুস নুদুস মানুষ তার হাতে একটা হারমোনিয়াম। তারা এসেছে আমাদের স্কুলে সবাইকে জাতীয় সঙ্গীতের সুর শেখাতে।

আমাদের সবাইকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা বড় একটা ক্লাশরুমে বসেছি। সামনে মঞ্চে বসেছে মানুষ দুজন। ট্রেনিং মাস্টারদের মাঝে যারা গান গায় তাদেরকে একজন একজন করে মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর একটা বিচিত্র জিনিস ঘটতে শুরু হল। আমরা দেখলাম গাল ভাঙ্গা টাক মাথার শুকনো মানুষটা বিকট হেড়ে গলায় চেঁচিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের ট্রেনিং মাস্টারও তার সাথে তাল মিলিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে আর তাই দেখে আমরা সবাই হেসে কুটি কুটি হয়ে যেতে লাগলাম। গান জিনিসটা আমরা জানতাম আনন্দের কিন্তু আমাদের সামনে যেটা ঘটছে তার মাঝে কোন আনন্দ নেই- দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব কষ্টের। শুকনো দড়ির মত মানুষটা খুব খুত খুতে, আমাদের ট্রেনিং মাস্টার যত দরদ দিয়েই চেষ্টা করুক না কেন কিছুতেই তার পছন্দ হয় না, মাথা নেড়ে বলে, "আচ্ছি নেহী, আচ্ছি নেহী।"

একজন একজন করে সব ট্রেনিং মাস্টাররা চেষ্টা করে গেলেন কিন্তু কোনটাই তার পছন্দ হয় না। শেষে উপায় না দেখে যারা গান গাইতে পারে না তাদেরকেও মঞ্চে তুলে দেওয়া হতে লাগল । তাদের বিকট গান শুনে আমাদের ইচ্ছে হল ছুটে পালাই কিন্তু হাসাহাসি করার এমন সুযোগ আর কোথায় পাব? আমরা তাই পিছনে বসে হি হি করে হাসতে লাগলাম।

এর মাঝে একজনকে মঞ্চে তোলা হল যার গলায় শুধু যে কোন সুর নেই তাই নয়, মনে হয় সে গান গাইলে আশে পাশে অন্য কোথাও যদি সুর থাকে সে সেটাও শুষে নেয়। এই ট্রেনিং মাস্টারটি নিজেও সেটা জানত এবং মঞ্চে উঠে সে গান গাইবার কোন চেষ্টাও করল না। হেড়ে গলায় দাদ ও খুজলীর মলম বিক্রি করার সুরে গানটা আবৃত্তি করে গেল। আমাদের ভয় হল শুকনো দড়ির মত মানুষটা বুঝি রেগে মেগে তাকে মেরেই বসে। কিন্তু তখন হঠাৎ একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, আমরা হতবাক হয়ে দেখলাম শুকনো দড়ির মত মানুষটা উচ্ছ্বাসিত হয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রায় কেঁদে ফেলল। ধরা গলায় বলতে লাগল "মারহাবা মারহাবা বহুত আচ্ছা গানা, কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ....."

তার হাবভাব দেখে বুঝতে পারলাম দাদ এবং খুজলীর মলম বিক্রি করার সুরে গানটিকে যিনি আবৃত্তি করে ফেললেন সেটাই হচ্ছে প্রকৃত গানের সুর। কাজেই আমাদের সেই ট্রেনিং মাস্টারকে দায়িত্ব দেয়া হল আমাদের সবাইকে জাতীয় সঙ্গীত শেখানো।

আমরা যে জাতীয় সঙ্গীতে খুব বেশীদূর যেতে পারি নি বিচিত্র কি?

ডাইরী

স্কুল থেকে এসে দেখি বাবা আমাদের সবার জন্যে একটা করে ডাইরী এনেছেন। ভাইবোন সবাইকে একটা করে ডাইরী দিয়ে বললেন,"এখন থেকে সবাই ডাইরী লিখবে। ডাইরী লেখার অভ্যাস খুব ভাল অভ্যাস।"

ডাইরী কেমন করে লিখতে হয় সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। কাউকে জিজ্ঞেস করেও লাভ হল না কেউ পরিষ্কার করে বলতে পারল না। আমি তাই আমার চকচকে নূতন ডাইরী নিয়ে ঘুরে বেড়াই সেখানে কিছু আর লেখা হয় না।

কয়েকদিন পর হঠাৎ আমার বড় ভাইয়ের ডাইরী খুলে দেখি সে অনেক কিছু লিখে ফেলেছে। অন্যের ডাইরী পড়ার মত মজা আর কীসে আছে? আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়তে থাকি"..... মারামারিতে বিশেষ সুবিধা করিতে পারি নাই। পরের বার, এই এলাকায় আসিলে তাহাকে শক্ত ধোলাই দেওয়া হইবে....."

আমি তাড়াতাড়ি আমার ডাইরীতে লিখে ফেললাম,"..... মারামারিতে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। পরের বার এই এলাকায় আসিলে তাহাকে শক্ত ধোলাই দেওয়া হইবে।....."

ডাইরী লেখার সমস্যা মিটে যাওয়ায় আমার বিশেষ আনন্দ হল। কয়দিন পরে পরেই আমি তার ডাইরী খুলে দেখি, সে যেটা লিখেছে আমি হুবহু সেটা আমার ডাইরীতে লিখে ফেলি। তার স্কুলের ঘটনা, খেলার খবর বই পড়ার গল্প, মারামারি হাতাহাতির বর্ণনা সব কিছু তার ডাইরী দেখে দেখে আমি আমার ডাইরীতে টুকে ফেললাম।

একদিন গোপনে যখন তার ডাইরী দেখে দেখে আমি আমার ডাইরীতে তথ্য পাচার করছি তখন হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলাম, তখন আমার ভাইয়ের রাগ কে দেখে। প্রথমতঃ তার ডাইরী পড়েছি, শুধু তাই না সেটা আবার আমার ডাইরীতে টুকে ফেলেছি। কাজটা যে অন্যায় সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল না, একটা ছোট ধোলাই খাওয়ার পর সে ব্যাপারে আরো নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম। শুধু যে পরের ডাইরী দেখে নিজের ডাইরী লেখার অভ্যেস দূর হয়ে গেল। তাই নয় আমার ডাইরী লেখারই ইচ্ছে জন্মের মত মুছে গেল!

বিহারী

স্কুলে আমার অনেক বন্ধু ছিল, তার মাঝে কিছু ছিল খাঁটি বন্ধু, কিছু ছিল ভেজাল। যারা খাঁটি বন্ধু ছিল তারা আমাকে কখনো বিপদে ফেলার চেষ্টা করত না। কিন্তু ভেজাল বন্ধুদের নিয়ে নানা রকম ঝামেলা হত। এই ভেজাল বন্ধুদের একজন একদিন আমাকে একটা উর্দু কবিতা শেখালো। ছোট চার লাইনের কবিতা শিখতে বেশী সময় লাগার কথা নয়। আমি উর্দু একেবারেই জানতাম না বলে কবিতাটির অর্থ কিছুই বুঝি নি। তবে সেটা যে বিহারীদের নিয়ে টিটকারী মেরে লেখা কবিতা সেটা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় নি।

আমার ভেজাল বন্ধুটি (সে আমাকে আনি ঘষে সিকি তৈরী করতে শিখিয়েছিল) আমাকে কবিতাটি শিখিয়ে বলল, "ঐ যে দেখছ একটা মেয়ে তার ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে যাচ্ছে তার সামনে গিয়ে এই কবিতাটা বল।"

"কি হবে বললে?"

"অনেক মজা হবে, দেখ।"

মেয়েটা আমার বয়সী। নিরীহ একটা মেয়ে, ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। চেহারা এবং পোষাক দেখে বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা বাঙালি নয়, বিহারী। কবিতাটা শুনে মেয়েটা রেগে যেতে পারে কিন্তু তার বেশী আর কি হবে। কিন্তু বন্ধুটি বলছে অনেক মজা হবে, তাই মজা দেখার লোভে আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে কবিতাটি আবৃত্তি করলাম।

তারপর যে ব্যাপারটি ঘটল তার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। ছোট সাদাসিধে মেয়েটি একটা রণ হুংকার দিয়ে তার ছোট ভাইকে মাটিতে নামিয়ে দিল, তারপর সে গুলির মত আমার দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমাকে ধরে সে কী করবে কে জানে, কিন্তু সেটা আবিষ্কার করার মত সাহস আমার নেই। আমি প্রাণ নিয়ে ছুটতে শুরু করলাম, আমার পিছু পিছু সেই মেয়েও ছুটতে লাগল। আমাকে ধরতে পারলে যে সে আমার বারটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে সে বিষয়ে তখন আমার ভিতরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটে কোনমতে নিরাপদ এলাকায় পালিয়ে এসেছিলাম। কোন মেয়ে আমাকে ধরে পেটানোর চেষ্টা করছে সেটা ছিল সেই প্রথম এবং সেই শেষ।

সেই মেয়েটি নিশ্চয়ই খুব তেজস্বী একটা মেয়ে হিসেবে বড় হয়েছিল। পৃথিবীতে কয়টা মেয়ে আছে যারা ছেলেদের ধরে পেটানোর জন্যে তাদের পিছু ধাওয়া করে? উনিশ শ একাত্তুরে বিহারীরা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল তাই স্বাধীনতার পর এ দেশের বিহারীদের উপর এক ভয়ংকর দুঃসময় নেমে এসেছিল। সেই তেজস্বী মেয়েটির কী হয়েছিল কে জানে। আমার বড় ভাবতে ইচ্ছে করে মেয়েটির আর তার পরিবারের সব দুঃখ কষ্ট মিটে গিয়ে এখন খুব সুখে তারা কোথাও বেঁচে আছে।

মিলিটারী

দুপুরে টিফিনের ছুটিতে আমরা সাধারণতঃ মাঠে কিং কুইন খেলি। একদিন কি কারণে খেলা হচ্ছে না, যার টেনিস বল আনার কথা সে আনতে ভুলে গেছে। আমরা তাই ছাড়া ছাড়া ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ কলতলায়, কেউ কাঁঠাল গাছের নিচে, কেউ বারান্দায়। আমি আর আরেক জন স্কুলের গেটে। আমার সাথে যে দাঁড়িয়ে আছে সে সবচেয়ে দূরন্ত ছেলেদের একজন নয় কিন্তু তার মাথা থেকে দুষ্টুমির চমৎকার সব আইডিয়া বের হয়। আজকে যে রকম সে সময় কাটানোর জন্য এক নম্বর একটা খেলা আবিষ্কার করেছে। রাস্তা থেকে তেতুলের বিচির মত ছোট ছোট অনেকগুলি নুড়ি পাথর হাতে তুলে নিয়েছে। যখনই রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি যায় সে নুড়ি পাথর দিয়ে সেটাকে লাগানোর চেষ্টা করে।

খেলা মোটামুটি জমে উঠেছে। আমার বন্ধুটি আমাকেও খেলায় যোগ দেওয়ার জন্যে টানাটানি করছে কিন্তু আমি ঠিক সাহস পাচ্ছি না। ছেলেবেলাকার মত এখন আর হাবাগোবা নই, নানারকম দুষ্টুমী করা শিখেছি কিন্তু চলন্ত গাড়ীতে নুড়ি পাথর ছুঁড়ে মারা আমার হিসেবে বড় ধরণের দুষ্টুমী, এখনো তার ট্রেনিং শেষ হয় নি।

মোটামুটি ভালই চলছিল খেলা। এরকম সময়ে একটা গাড়ী এগিয়ে এল, বন্ধুটি পাথর ছোড়ার জন্য এত তীক্ষ্ণ মনোযোগী হয়েছিল যে গাড়ীর ভেতরে কে বসে আছে সেটা লক্ষ্য করল না, আমি লক্ষ্য করলাম পিছনে বসে আসে একজন মিলিটারী অফিসার, সে নিশ্চয়ই খুব বড় অফিসার কারণ তার চেহারা খুব জাঁদরেল তার কাঁধে এবং হাতে নানারকম তারা লাগানো, বুক পকেটের উপরে নানা রংয়ের ব্যাজ। শুধু তাই না গাড়ীর সামনে বসে আছে কয়েকজন মিলিটারী, তাদের মুখের চেহারা বিজাতীয় আর নিষ্ঠুর, তাদের হাতে ভয়ংকর অস্ত্র। তারা চুপচাপ বসে নেই, মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। আমি আমার বন্ধুটিকে সাবধান করার চেষ্টা করলাম কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। সে নিখুঁত নিশানায় নুড়ি পাথরটি ছুঁড়ে মেরেছে এবং সেটা "ঠকাশ" করে লেগেছে গাড়ীর কাঁচে।

তারপর যা ঘটল তার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না, গাড়ী হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল, দুইপাশের দুই দরজা খুলে গেল আর সেখান থেকে লাফিয়ে নেমে এল দুই জওয়ান। তাদের হাতে ভয়ংকর অস্ত্র, সেটার ট্রিগারে হাত রেখে তারা ছুটে এল আমাদের দিকে।

দুষ্টুমীতে আমি নুতন কিন্তু আমার বন্ধু ঘাঘু মানুষ। এরকম অবস্থায় কি করতে হয় সে খুব ভাল করে জানে। কিছু বোঝার আগেই দেখলাম সে পাঁই পাঁই করে স্কুলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। মিলিটারী দুইজন তাকে দেখল এবং অস্ত্র তাক করে তার দিকে ছুটতে লাগল। আট নয় বছরের একটা বাচ্চার পিছনে দুইজন মুশকো জোয়ান অস্ত্র তাক করে ছুটছে দৃশ্যটা একই সাথে ভয়ংকর আর হাস্যকর।

আমার বন্ধুটি অত্যন্ত ঘাঘু মানুষ। সে একটা ক্লাশ ঘরে ঢুকে পড়ল। সেই ক্লাশ ঘরের পার্টিশানে একটা ফোকড় ছিল, সেই ফোকড় দিয়ে পাশের ক্লাশ ঘরে গিয়ে শিক্ষকদের চেয়ার টেবিল রাখার যে নিচু মঞ্চ রয়েছে তার নিচে হার্চড়ে পার্চড়ে ঢুকে গেল।

জওয়ান দুইজন হাতে অস্ত্র নিয়ে এই ঘর ওই ঘর খুঁজে বেড়াল, বিজাতীয় ভাষায় গালি গালাজ করল তারপর কাউকে খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরে গেল।

তখন বুঝতে পারি নি কিন্তু এখন আমার মনে হয় আমার সেই দুষ্টু বন্ধুটির মত সৌভাগ্যবান মানুষ খুব কম রয়েছে। তাকে যদি খুঁজে বের করতে পারত তার কি অবস্থা হত চিন্তা করেও আমি শিউরে উঠি। এরা হচ্ছে সেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী যারা আনন্দে চিৎকার করতে করতে উনিশ শ একাত্তুর সালে তিরিশ লক্ষ মানুষকে খুন করেছিল। সেটা নিয়ে এতদিন পরেও তাদের মনে এতটুকু গ্লানি নেই।

আমার সেই বন্ধুটিরই গল্প। সে নানারকম দুষ্টবুদ্ধি ভেবে ভেবে বের করে বলে পড়াশোনায় বিশেষ সময় পায় না। ক্লাশে এলে স্যারদের মার খেতে হয়, সে সেটা নিয়ে বিশেষ কিছু মনে করে না।

একদিন স্যার ক্লাশে পড়া জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধুটি অনেকক্ষণ নানাভাবে চিন্তা করে পড়াটা ভেবে বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু একটা জিনিস বাসা থেকে পড়ে না এলে শুধু ভেবে ভেবে সেটা বের করা যায় না। বন্ধুটিও বের করতে পারল না। স্যার অসম্ভব রেগে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কপাল ভাল ছিল আমি সেটা পেরে গেলাম। স্যার তখন হুংকার দিয়ে আমাকে বললেন,"ইকবাল, যা তুই ওর কান ধরে দশ বার ওঠ বোস করা।"

শুনে আনন্দে আমার সবগুলি দাঁত বের হয়ে এল। যে সব কাজ কর্ম শুধু স্যারেরা করেন, আজকে সেই কাজটি করার বিরল সম্মানটি আমাকে দেওয়া হচ্ছে, গর্বে আমার বুক দশ হাত ফুলে গেল। আমি লাফিয়ে বন্ধুর কাছে গিয়ে তার কান ধরে দশ বার ওঠবোস করালাম, ভারী আনন্দ হল আমার।

রাত্রে আমরা খেতে বসেছি। হঠাৎ স্কুলে বন্ধুকে কান ধরে ওঠবোস করানোর ঘটনাটি আমার মনে পড়ল । আমি তখন সবাইকে খুব উৎসাহ নিয়ে গল্পটি শোনালাম। আমার ধারণা ছিল সবাই গল্পটি শুনে খুব আনন্দ পাবে কিন্তু দেখা গেল সেটা সত্যি নয়। বাবা আর মা খাওয়া বন্ধ করে খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাবা মেঘ স্বরে বললেন, "কি বললি?"

বাবার গলার স্বরে আমি ঘাবড়ে গেলাম। তবু ভয়ে ভয়ে গল্পটা দ্বিতীয়বার বলতে হল। বাবা তখন হুংকার দিয়ে বললেন, "তুই তো বন্ধুর কান ধরে ওঠবোস করিয়েছিস?"

আমার বাবা খুব ঠান্ডা মেজাজের মানুষ ছিলেন, কখনই গলার স্বর উঁচু করতেন না। হঠাৎ করে এভাবে রেগে যাবেন আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আমি একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে গেলাম। বাবা ভয়ংকর রেগে গিয়ে বললেন, "তুই এত বড় গাধা, এত বড় হৃদয়হীন পাষন্ড যে নিজের বন্ধুর কান ধরে তাকে সারা ক্লাশের সামনে ওঠবোস করিয়েছিস?"

বাবার ধমক খেয়ে এখন আমি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করলাম। আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "আমি কী করব? স্যার বললেন।"

"স্যার বললেই তুই করবি?"

"না করলে স্যার উল্টো আমাকে মারত।"

"মারলে মার খাবি। মানুষ মার খায় না? না হলে একদিন একজন বন্ধুর জন্যে মার খেলি। তাই বলে সারা ক্লাশের সামনে বন্ধুকে অপমান করবি?"

বাবা খাওয়া রেখে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "ওঠ। তুই এখনই তোর বন্ধুর বাসায় যাবি, তার কাছে মাফ চেয়ে আসবি।"

আমি চোখ মুছতে মুছতে বললাম, "কিন্তু আমি তো তার বাসা চিনি না।"

মা বললেন, "থাক এখন রাত হয়েছে। কাল ভোরে স্কুলে গিয়ে মাফ চাইলেই হবে।"

বাবা বললেন, "ঠিক আছে, কোন ভুল যেন না হয়। আর কোনদিন যেন এরকম ঘটনা না শুনি।"

পরদিন আমি আমার সেই বন্ধুকে খুঁজে বের করলাম, ধুলো এবং মাটি দিয়ে সে আরেকটা খেলা আবিষ্কার করে মহানন্দে খেলছে। আমি তাকে ডেকে সরিয়ে নিয়ে এসে বললাম, "শোন, তোর সাথে একটা কথা আছে।"

"কি কথা।"

"আমি কেশে একটু গলা পরিষ্কার করে বললাম, "গতকাল একটা ভুল হয়ে গেছে।

"কি ভুল?" সে একটু রেগে গিয়ে বলল, "কি ভুল করেছি আমি?"

"তুই করিস নি। আমি করেছি।"

"তুই ভুল করেছিস তো আমাকে বলছিস কেন? আমি কি করব?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "ভুলটা তোকে নিয়ে তাই তোর কাছে মাফ চাইতে এসেছি।"

"মাফ?"বন্ধুটি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, "আমার কাছে মাফ চাইতে এসেছিস?'

"হ্যাঁ।"

বন্ধুটি বোঝার চেষ্টা করল আমি ঠিক কী ভাবে তামাশা করার চেষ্টা করছি। যখন বুঝতে পারল আমি তামাশা করছি না তখন সে একটু ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলল, "কেন মাফ চাইতে এসেছিস?"

"মনে নাই কালকে তোর কান ধরে ওঠবোস করিয়েছিলাম?"

বন্ধুটি মনে করার চেষ্টা করে বলল, "করিয়েছিলি নাকি?"

"হ্যাঁ। মনে নাই?"

বন্ধুটি মাথা চুলকাল, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অঙ্ক ক্লাশে।"

"অঙ্ক নয়। ইতিহাস ক্লাশে-"

"ইতিহাস নাকি?" বন্ধুটি আবার মনে করার চেষ্টা করতে থাকে।

আমি মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

পি. টি স্কুল ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত। দেখতে দেখতে আমরা ক্লাশ ফাইভ পাশ করে হাই স্কুলে উঠে গেলাম। হাই স্কুলে উঠে বন্ধু বান্ধবের অনেক পরিবর্তন হল, কেউ কেউ অন্য স্কুলে গেল, কেউ কেউ ফেল করে পি.টিড় স্কুলেই রয়ে গেল। আবার অন্যান্য স্কুল থেকে ছেলেরা হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। জন্মের পর থেকে শেফু আর আমি এক স্কুলে পড়ে আসছি। এখন সে গেল মেয়েদের স্কুলে। আমার নানা ধরনের দুষ্টুমী আর অপকর্মের চাক্ষুষ সাক্ষী আর থাকবে না। বলা যেতে পারে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

পি, টি, স্কুলে আমরা ছিলাম সবচেয়ে উঁচু ক্লাশের ছাত্র, এই স্কুলে এসে আমরা হলাম সবচেয়ে নীচু ক্লাশের ছাত্র। কেউ আমাদের এতটুকু পাত্তা দেয় বলে মনে হল না। পি.টি. স্কুলে আমরা সব স্যারদের মান সম্মান করে চলতাম। এই স্কুলে এসে খবর পেলাম সব স্যারদের আড়ালে অন্য নাম দিয়ে ডাকা হয়। আমাদের ক্লাশ টিচারের নাম ব্যাটারী। সার্থক নামকরণ, স্যার ছোটখাট মানুষ, শরীরের উপর ছোট মাথা দেখে ডি.সাইজ ব্যাটারীর মতই মনে হয়। এই স্যারের নানারকম গুণ ছিল, কথায় কথায় কবিতা বানিয়ে ফেলতেন, খুব উঁচু শ্রেণীর কবিতা নয়, কিন্তু কবিতা তাতে সন্দেহ নেই। স্যারের আরেকটা মজার গুণ ছিল, ক্লাশের শুরুতে যখন টিফিনের দপ্তরী খাতা নিয়ে জানতে আসত কতজন ছাত্র এসেছে, স্যার বেশী করে লিখে দিতেন, তখন যতজন ছাত্র তার থেকে বেশী টিফিন চলে আসত। সেই বাড়তি টিফিন স্যারকে দেয়া হতো আর স্যার সেগুলি খুব সখ করে খেয়ে হাত তুলে আমাদের জন্যে দোয়া করতেন। আমরা সবাই তখন সেই দোয়ায় শামিল হতাম।

স্যার এমনিতে খুব মজার মানুষ ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ খুব রেগে যেতেন। যখন তিনি রেগে যেতেন তখন তাঁর নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ থাকত না। একেকজনকে ধরে গরুর মত পেটাতেন। চড় মেরে একবার আমার এক বন্ধুর কানের পর্দা ফাটিয়ে ফেলেছিলেন।

ছেলেদের মারার কিছুক্ষণ পর স্যারের খুব মন খারাপ হয়ে যেতো। তখন সেই ছাত্রকে ডেকে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদতে শুরু করতেন। পুরো জিনিসটা ছিল খুব বিচিত্র।

ব্যাটারী স্যার ছাড়াও আমাদের নানা ধরনের বিচিত্র স্যার ছিল। সবাই যে বিচিত্র ছিলেন তা নয়, কিন্তু যারা বিচিত্র শুধু তাদের কথাই মনে আছে। যেমন আমাদের আরবী স্যারের ধারণা ছিল তিনি খুব বাংলা জানেন তাই ক্লাশে এসে তিনি শুধু বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করতেন। ধর্ম স্যারেরও পড়াশোনাতে বেশী মন ছিল না, চেয়ারে পা তুলে বসে নাকের লোম ছিড়তেন। সে কারণে সব

সময় তার নাক লাল হয়ে থাকত। ইতিহাস স্যার মাথায় টুপি পরে ঘুরে বেড়াতেন, টিফিন ছুটিতে তিনি জোর করে আমাদের জোহরের নামাজ পড়াতেন। যারা পরত না তাদের কপালে শক্ত শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। একদিন স্যার ক্লাশে এসে আবিষ্কার করলেন আমি হাফ প্যান্ট পরে এসেছি। সাথে সাথে খপ করে আমার কান ধরে ফেললেন, চোখ পাকিয়ে বললেন, "হাফ প্যান্ট পরে এসেছিস? নামাজ পরবি কেমন করে?"

আমি কাতর গলায় বললাম, "স্যার, ব্যাগে লুঙ্গি আছে।"

স্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, "ব্যাগে লুঙ্গি আছে?"

"জী স্যার।"

"দেখা।"

আমি ব্যাগ খুলে দেখালাম সত্যিই ব্যাগে লুঙ্গি। বললাম, "স্যার যখন নামাজ পরার সময় হয় তখন হাফ প্যান্টের উপর লুঙ্গি পরে নামাজ পড়ে ফেলি।"

শুনে স্যারের চোয়াল ঝুলে পড়ল, খুশী হবেন না রাগ হবেন বুঝতে না পেরে কানটা আরেকবার মুচড়ে ছেড়ে দিলেন।

আমাদের ভিতরে সবচেয়ে নৃশংস যে স্যার ছিলেন তাঁর চেহারা ছিল খুব সুন্দর। যতদূর মনে পড়ে তার ডাক নাম ছিল ডান্ডি। তার ইংরেজী পড়ানোর কথা কিন্তু তিনি কখনো কিছু পড়াতেন না। তিনি ক্লাশে এসে শুধুমাত্র আমাদের অত্যাচার করতেন। আর সে কী অত্যাচার- কেউ যদি শুনে সেটা বিশ্বাস করবে না। এগারো বারো বছরের ছেলেদের কেউ যে সম্পূর্ণ অকারণে এরকম ভয়ংকর নৃশংস অমানবিক শাস্তি দিতে পারে আমার এতদিন পরে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়- কিন্তু আমি অবিশ্বাস করব কেমন করে? সব আমার নিজের চোখে দেখা। আমাদের বাবা মায়েরা জানতেও পারতেন না কি ভয়ংকর দানবের হাতে তাদের ছোট বাচ্চাদের তুলে দিয়েছিলেন। এতদিন পরেও তার সেই শাস্তিগুলির কথা আমি লিখতে পারছি না- আমার নিজেকে কখনো সেই শাস্তি পেতে হয় নি কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধবদের সেই শাস্তি পেতে দেখে দুঃখে কষ্টে আর আতংকে আমাদের সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকত।

আমার খুব ইচ্ছে করে এই মানুষটাকে খুঁজে বের করতে, তাহলে আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, "কেমন করে এগারো বারো বছরের ছেলেকে আপনি এটা করতেন? দানব কি শুধু কল্প কাহিনীতে থাকে? না, দানব থাকে সত্যিকারের জীবনে- আপনি হচ্ছেন সেই দানব।"

এখনো না জানি এরকম কত দানব ছোট ছোট বাচ্চাদের ধ্বংস করার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একদিন শুনতে পেলাম শেফুকে আর স্কুলে যেতে হবে না। তার নাকি চিকেন পক্স হয়েছে। ব্যাপারটা কী আমরা তখনো জানি না, কিন্তু যে জিনিসটা হলে স্কুলে যেতে হয় না সেটা নিশ্চয়ই খুব খারাপ হতে পারে না। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি ব্যাপারটা খারাপই, সারা শরীরে গুটি বের হয়েছে, দেখলে ঘেন্নায় বমি এসে যেতে চায়। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে শেফু কুঁ কুঁ করে কাঁদতে শুরু করল। তাই দেখে বাবা তাকে অনেক আদর করে অসুখ ভাল হয়ে যাবার পর পুতুল কেনার জন্যে টাকা দিলেন। মা ডাব কিনে আনলেন, কিছু খাওয়া হবে, কিছু দিয়ে তার মুখ ধুইয়ে দেয়া হবে। বাসায় আমাদের মামা আর চাচা থাকতেন। তারা তার জন্যে গল্পের বই কিনে আনলেন। শেফুর খাওয়ার রুচি নেই বলে সে যেটা খেতে চায় সেটা অনেক যত্ন করে রান্না করা হল। তাকে যত্ন করে খাওয়ানো হল, বাবা তার মন ভাল করার জন্যে শিবরাম চক্রবর্ত্তীর বই পড়ে শোনালেন। সারা বাসায় সবাই শেফুর যত্ন করার জন্যে ছোটাছুটি করতে লাগল।

শেফু কয়দিন ভুগে ভাল হয়ে গেল, তখন বড় ভাইয়ের চিকেন পক্স হল, অসুখটা যে ছোয়াচে তখন সেটা আমরা নূতন করে টের পেলাম। আমার বড় ভাই অল্পতে কাতর হয়ে যায়। সে অসুস্থ হয়ে এমন হাক ডাক শুরু করল যে সবাই ছোটাছুটি শুরু করল। তার চিকেন পক্স ভাল না হতেই আরেকজনের হয়ে গেল, এবার তাকে নিয়ে ছোটাছুটি।

আমরা সব মিলিয়ে ছয় ভাইবোন, রোগ শোকের বিরুদ্ধে আমার শরীরে প্রতিষেধক একটু বেশী বলেই কি না জানি না- আমার হল সবার শেষে। কিন্তু ততদিন অন্য পাঁচজনের হয়ে গেছে অসুখটা প্রায় ডাল ভাত -কেউ সেটাকে এতটুকু গুরুত্ব দিতে রাজী নয়। যেদিন আমার সারা শরীরে গুটি বের হয়েছে আমি মা'কে গিয়ে বললাম, "আম্মা, আমার চিকেন পক্স হয়েছে।"

মা বললেন, "হয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ, আম্মা, এই যে।"

মা কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না, বললেন, "যা বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাক।"

আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে রইলাম। যেই আমার ঘরে এল তাকেই আমি বললাম, "আমার চিকেন পক্স হয়েছে।"

কেউ আমার কথা ভাল করে শুনল বলে মনে হল না। আমি অসুখ ভাল হবার পর পুতুল কেনার জন্যে টাকা পেলাম না, গল্প বই পেলাম না, রাত্রি বেলা শিবরাম চক্রবর্ত্তী পেলাম না, ভাল মন্দ খাবার পেলাম না,মুখ ধোবার জন্যে ডাবের পানি পেলাম না। আগে যার অসুখ ছিল তার জন্যে কিছু ডাব কেনা হয়েছিল। সেখান থেকে খানিকটা ডাবের পানি একটা গ্লাসে করে একবার খেতে দেয়া হল। আমি সেটা খেয়েই বিছানায় শুয়ে শুয়ে শরীর চুলকাতে লাগলাম। শুনতে পেলাম অন্য সবাই তাদের অসুখের মাঝে যেসব উপহার পেয়েছে সেগুলি

দিয়ে হৈ চৈ করে খেলছে। এই পোড়া অসুখটা যে সবার শেষে আমার কাছে এসে এমন দাগাবাজী করবে সেটা কে জানত।

সেই থেকে আমি চিকেন পক্সকে দুই চোখে দেখতে পারি না।

কালা পাহাড়

আমি যখন ক্লাশ সেভেনে উঠেছি তখন বাবা চট্টগ্রাম থেকে বদলি হয়ে বগুড়ায় চলে এলেন, সেখানে আমাকে আর আমার বড় ভাইকে বগুড়া জিলা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হল। স্কুলের পোষাক হচ্ছে ছাই রংয়ের সার্ট আর ঝোলা পায়জামা। সেই পোষাকে ছাত্রদের একেবারে ছাগলের মত দেখায় কিন্তু কিছু করার নেই, যে স্কুলের যে রকম পোষাক। (বছর খানেক পরে অবশ্যি পোষাকটাকে পাল্টে দিয়ে অনেক সুন্দর করা হয়েছিল।)

প্রথম যেদিন ক্লাশে গিয়েছি ক্লাশ টিচার জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, তোর মা কয়জন?"

আমি বুঝতে না পেরে একটু থতমত খেয়ে গেলাম, স্যার আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোর মা কী একজন না দুইজন ? ঘরে কি সৎ মা আছে তোর?"

আমি মাথা নাড়লাম, "নাই স্যার। মা একজন আমার।"

"ও।" দেখে মনে হল স্যারের একটু মন খারাপ হয়ে গেল। স্যার এমনিতে ভাল মানুষ। সব কিছু স্বাভাবিক, শুধু ক্লাশে নূতন ছেলে এলেই কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, "তোর কয় মা?

কয়দিন স্কুলে ক্লাশ করার পর মোটামুটি স্কুলের সাথে আর নিয়ম কানুনের সাথে পরিচয় হল। কিছু বন্ধুবান্ধব হল। বিভিন্ন স্যার আর তাদের চালচলনের সাথে পরিচয় হল। কলেজিয়েট স্কুলে যেমন সব স্যারের একটা নাম ছিল এখানে সেরকম নয় শুধুমাত্র একজন স্যারের নাম দেয়া আছে। তিনি কালো এবং তিনি পাহাড়ের মত বড় এজন্যে খুব সঙ্গত কারনেই তার নাম দেয়া হয়েছে কালাপাহাড় । তাকে জেলখানার মেট হিসেবে চাকুরী দিয়ে রাখা যেতে পারে কিন্তু কিছুতেই তাকে শিক্ষক হিসেবে রাখার কথা নয়। কিন্তু তিনি স্কুলেই আছেন এবং কোনদিন কোন ছেলে যদি স্কুলে মারা যায় তাহলে যে এই স্যারের হাতেই মারা যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সপ্তাহে তার খুব বেশী ক্লাশ থাকে না, কিন্তু যেদিন থাকে সে দিন আমাদের মেরুদন্ড দিয়ে ভয়ের শীতল স্রোত বইতে থাকে। আমার জীবনের সবচেয়ে বিচিত্র ঘটনাটি ঘটেছিল এই কালাপাহাড়ের ক্লাশে।

রুটিন অনুযায়ী সেদিন বাংলা ব্যাকরণ ক্লাশ। কিন্তু কালাপাহাড় এসে বললেন আজ তিনি রচনা পড়াবেন। যারা কালা পাহাড়কে চেনে তারা সবসময় প্রস্তুত থাকে ক্লাশ থাকুক কি নাই থাকুক ব্যাগের মাঝে রচনা আর ব্যাকরণ খাতা, বই, হোমওয়ার্ক সব কিছু মজুত রাখে। তবে সব সময়েই কিছু ছেলে থাকে যারা হয় বেকুব না হয় আত্মঘাতী এবং সব সময়েই তারা বিপদে পড়ে, আজকেও অনেকে কালাপাহাড়ের ফাঁদে পড়ে গেল। কালাপাহাড় একজন একজন করে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করছেন এবং যারা রচনা খাতা আনে নি তাদেরকে

একেকভাবে শাস্তি দিচ্ছেন। আমার আগের ছেলেটিকে কালাপাহাড় জিজ্ঞেস করলেন, "রচনা খাতা এনেছিস?"

"না স্যার।"

সাথে সাথে তিনি ডাস্টারটা তার দিকে ক্রিকেট বলের মত ছুঁড়ে মারলেন, ডাস্টারটা ঠাস করে তার মাথায় লেগে ছিটকে উঠল এবং তার মাথাটা বলের মত ফুলে উঠল। কালাপাহাড় এবার আমার দিকে তাকালেন, আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমিও রচনা খাতা আনি নি কিন্তু অধিক শোকে মানুষ যেরকম পাথর হয়ে যায় অধিক ভয়েও মানুষ মনে হয় সাহসী হয়ে ওঠে।

কালা পাহাড় বললেন, "দেখি তোর রচনা খাতা।"

আমি খুব পরিষ্কার গলায় বুক উঁচু করে বললাম, "আনি নাই স্যার।"

সারা ক্লাশ কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে গেল। কালাপাহাড় টেবিল থেকে ডাস্টারটা হাতে তুলে নিয়ে থমথমে গলায় বললেন, "আনিস্ নাই?"

"না স্যার।"

কালা পাহাড় ডাস্টারটা আমার দিকে তাক করতে করতে বললেন, "কেন আনিস নাই?"

"আজকে ব্যাকরণ ক্লাশ, রচনা খাতা কেন আনব?"

মনে হল ক্লাশের মাঝে বুঝি একটা বোমা পড়েছে, কালাপাহাড় হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সমস্ত ক্লাশ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে কেউ তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কালাপাহাড় আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমিও কালাপাহাড়ের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এইভাবে কয়েকমুহূর্ত কেটে গেল। আমার কাছে মনে হল কয়েক যুগ। কালাপাহাড় শেষে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "বস।"

আমি বসে পড়লাম, শুনলাম আমার পরের জনকে জিজ্ঞেস করছেন, "রচনা খাতা কই?"

"আনি নাই স্যার।"

কালাপাহাড় সাথে সাথে বিদ্যুতের বেগে তার দিকে ডাস্টারটা ছুঁড়ে দিলেন, আমি একটা আর্তনাদ শুনলাম এবং দেখলাম কপালে লেগে ডাস্টারটা ছিটকে উপরে উঠে যাচ্ছে।

আমি যতদূর জানি কালাপাহাড়ের জীবনের ইতিহাসে আমি একমাত্র মানুষ যার মার খাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তবু মার খাই নি। কারণটা কি আমি এখনো জানি না। এই পৃথিবীতে মারধোর থেকে রক্ষা করে আমাকে সম্ভবতঃ পরকালে আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়া হবে।

বিদায় সম্বর্ধনা

বগুড়া জিলা স্কুলটা মোটামুটি একটা ভাল স্কুল ছিল। স্যারেরা ছেলেদের খেয়াল করতেন। কালাপাহাড় যে নানাভাবে ছাত্রদের শাস্তি দেন খবরটা নিশ্চয়ই অন্য স্যারেরা জানতেন এবং আমার মনে হয় সবাই মিলে চেষ্টা চরিত্র করে কালাপাহাড়কে একটা প্রাইমারী স্কুলে বদলী করে দেওয়া হল। খবরটা শুনে আমাদের আনন্দ দেখে কে? আমরা ক্লাশ রুমের দরজা বন্ধ করে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলাম।

কোন স্যার যখন স্কুল ছেড়ে চলে যান তখন তার জন্যে একটা বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। কাজেই কালাপাহাড়ের জন্যেও বিদায় সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হল। স্কুলের বারান্দায় একটা টেবিল পাতা হল, সেই টেবিলে একটা ফুলদানিতে কিছু ফুল, একটা জগে পানি এবং গ্লাশ এবং কালাপাহাড়ের জন্যে কেনা কিছু উপহার রাখা হল। যে কোন অনুষ্ঠান হলেই টেবিলে এক জগ পানি এবং একটা গ্লাশ রাখতে হয়। কারণ আমাদের একজন স্যার সবসময়েই খুব লম্বা বক্তৃতা দেন এবং বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি উত্তেজিত হয়ে যান, তার গলা শুকিয়ে যায় এবং তার ঢক ঢক করে পানি খেতে হয়।

যথা সময়ে কালাপাহাড়ের বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হল। প্রথমে ছাত্রদের কিছু বলার কথা। ছাত্রদের মাঝে কিছু পেশাদার বক্তা রয়েছে; তারা যে কোন উপলক্ষে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেলতে পারে। আজকে হয় তারা ছিল না, না হয় ঘাপটি মেরে ছিল। তাই আমাদের ক্লাশ টিচার আর কাউকে না পেয়ে আমাকে ডেকে বসলেন কিছু বলার জন্যে।

আমি নিঃশ্বাস ফেলে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালাম। একবার আড়চোখে কালাপাহাড়ের দিকে তাকালাম– চেয়ারে উবু হয়ে বসে আছেন। আমি একবার গলা খাকাড়ী দিয়ে শুরু করলাম, "".....আমাদের প্রিয় স্যার আজ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাই আজ আমাদের বেদনা ভারাক্রান্ত মন। তার মত শিক্ষক পাওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। তিনি আমাদের সন্তানের মত স্নেহ করতেন। তাঁর সেই স্নেহ সেই ভালবাসার কথা আমরা ভুলব না। কবির ভাষায় বলতে হয়, যেতে নাহি দিব হায় তবু যেতে দিতে হয়....."

প্রকাশ্য জনসমক্ষে মিথ্যা কথা বলার হাতে খড়ি আমার এই ভাবেই হয়েছিল।

পাগল স্যার

আমরা যখন ক্লাশ এইটে পড়ি, তখন আমাদেরকে একজন নূতন স্যার বিজ্ঞান পড়াতে এলেন। আগে এই স্যার এই স্কুলেই ছিলেন কিন্তু বিজ্ঞানের প্রচন্ড চাপে তার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা করিয়ে খানিকটা সুস্থ হয়ে আবার স্কুলে ফিরে এসেছেন। মাথা খারাপ হবার আগে তার থেকে জ্ঞানী শিক্ষক নাকি আর কেউ ছিল না। আর্কিমিডিসের সূত্র ছিল একেবারে নখের ডগায়, অম্ল আর ক্ষারের সংজ্ঞা বলে দিতে পারতেন চোখ বুঁজে।

আবার স্কুলে ফিরে আসার পর তাকে আমাদের ক্লাশে দেওয়া হয়েছে, উত্তেজনা এবং কৌতূহলে আমাদের নিঃশ্বাসই পড়ে না। প্রচন্ড জ্ঞানী শিক্ষক তো আর চারটি খানেক কথা নয়! কিভাবে পড়াবেন কি পড়াবেন সেইসব নিয়ে আমাদের জল্পনা কল্পনা হতে লাগল। তার উপর স্যারের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেটা নিয়েও বাড়তি কৌতূহল। তখন বয়স কম পাগল যে একটা অসুস্থতা এবং সেটা যে আসলে একটা কষ্টের ব্যাপার সেটা বুঝতে শিখি নি, ধরেই নিয়েছি পাগল মানেই হাসি তামাশা আর কৌতুকের জিনিস। চট্টগ্রামে যখন ছিলাম বাসার কাছে থাকত একজন পাগল। তার নাম ছিল নূরা পাগলা,কথা নেই বার্তা নেই সে সবার সামনে কাপড় খুলে ফেলত। নানা বাড়িতে আমাদের দূর সম্পর্কের এক মামার মাথায় দোষ আছে তার একমাত্র কাজ খোঁজ খবর করে বের করা কার পূর্বপুরুষ আসলে বাঁদী এবং গোলাম ছিল। এখানে আমাদের স্কুলের কাছে একজন পাগল থাকে, যখন ক্ষেপে যায় তখন সে রীতিমত ভয়ংকর কিন্তু এমনিতে চমৎকার মানুষ, আধ চামুচ পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে সে কীভাবে বেঁচে গেছে সেটা নিয়ে গল্প গুজব করত। আরো একজন পাগল মানুষ বগুড়ার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তার কাজ হচ্ছে যত লাইটপোস্ট আছে সবগুলিতে সাংকেতিক অক্ষর লেখা। এই সেদিন দেখেছি একটা সুঁচ দিয়ে আংগুল ফুটো করে সেই রক্ত দিয়ে খুব যত্ন করে সাংকেতিক অক্ষর লিখছে।

কাজেই আমাদের এই স্যার নিয়ে আমাদের খুব কৌতূহল। জ্ঞানী মানুষ বলে কৌতূহল, পাগল বলেও কৌতূহল। নির্দিষ্ট দিনে স্যার আমাদের ক্লাশে এলেন। তার চেহারায় জ্ঞানী মানুষের কোন চিহ্ন নেই। তিনি মোটা এবং বেঁটে, ধর থেকে মাথা শুরু হয়ে গেছে– গলার কোন নিশানা নেই। তার নাক একটু বোঁচা এবং গায়ের রং শ্যামলা। তাকে দেখে আমাদের খুব আশাভঙ্গ হল। জ্ঞানী মানুষ বলতেই চোখের সামনে যেরকম ঝাঁকড়া চুল এবং ভারী চশমার ক্ষ্যাপাটে মানুষের একটা ছবি ভেসে আসে স্যারের চোহারার মাঝে তার কোন চিহ্ন নেই।

স্যার ক্লাশে ঢুকে চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। তার বসার ভঙ্গি দেখে মনে হল তিনি এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবেন বা কিছু বলবেন, কিন্তু তিনি কিছু বললেন না বা

উঠেও দাঁড়ালেন না। সেইভাবে পিঠ সোজা করে বসে রইলেন। তার চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে, সেখানে কোন রকম অনুভূতির চিহ্ন নেই। মুখের ভঙ্গী ভাবলেশহীন। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্যারের কথা শোনার জন্যে বসে রইলাম, কিন্তু স্যার কোন কথা বললেন না। এইভাবে এক মিনিট দুই মিনিট করে পুরো ঘন্টা কেটে গেল এবং ক্লাশের ঘন্টা পড়তেই স্যার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ওঠার সময় এক মুহূর্তের জন্যে মাথা নীচু করেছেন। হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম তার চাঁদির ঠিক মাঝখানে চতুষ্কোন করে কামানো সেখানে কোন এক ধরণের ওষুধ লেপে দেওয়া আছে। আমার পাশে যে বসেছিল সে ফিস ফিস করে বলল, "তালোড়ার তেল।"

"সেটা কি?"

"পাগলদের ঔষধ। স্বপ্নে পাওয়া গেছে। চাঁদীতে মাখাতে হয়। দেখিস না। চাঁদি কামিয়ে রেখেছেন।"

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম। আর আমাদের জ্ঞানী এবং পাগল স্যার নিঃশব্দে ক্লাশ থেকে বের হয়ে গেলেন।

ঠিই এইভাবে পুরো বছর কেটে গেল। স্যার ক্লাশে এসে নিঃশব্দে বসে থাকতেন, ঘন্টা পড়লে আবার নিঃশব্দে বের হয়ে যেতেন। পৃথিবীর আর কোথাও কোন স্কুলে এরকম কিছু ঘটতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না!

বগুড়া জিলা স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন অসম্ভব কড়া মানুষ। সত্যি কথা বলতে কি কড়া কথাটার অর্থই আমি শিখেছি তাকে দেখে। ক্লাশ শুরু হওয়ার পর মাঝে মাঝে আমাদের হেড স্যার ক্লাশ পর্যবেক্ষন করতে বের হতেন। তার সাথে সাথে থাকত আমাদের দপ্তরী কালীপদ, সে পিছনে পিছনে হেড মাস্টারের বিখ্যাত বেতটি বহন করে নিয়ে যেতো। হেড স্যার হাঁটতে হাঁটতে কোন একটা ক্লাশের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং সাথে সাথে সেই ক্লাশের সব ছাত্রের বুকের ভিতরে আতংকের একটা শীতল হাওয়া বয়ে যেতো । সেই আতংকটি যে কোন পর্যায়ের আমি একদিন নিজের চোখে দেখতে পেলাম।

একদিন ক্লাশে পড়াশোনা হচ্ছে এবং হঠাৎ করে দরজায় ছায়া পড়ল, আমরা তাকিয়ে দেখলাম হেডস্যার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সাথে সাথে সমস্ত ক্লাশে আতংকের একটা শিহরণ বয়ে গেল। আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনার ভান করতে করতে চোখের কোনা দিয়ে হেডস্যারের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। হেড স্যার খানিকক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বললেন, "এই ছেলে।"

আমরা পুরো ক্লাশ চমকে উঠে "এই ছেলে"টি কোন ছেলে দেখার জন্যে হেড স্যারের দিকে তাকালাম, দেখলাম স্যার বেত দিয়ে আমার পাশে বসে থাকা ছেলেটির দিকে নির্দেশ করছেন। ছেলেটির মুখটি প্রথমে ছাইয়ের মত সাদা তারপর বেগুনি এবং সরশেষে সাদার মাঝে বেগুনি ছোপ ছোপ হয়ে গেল। হেড স্যার হুংকার দিয়ে বললেন, "দাড়াও। তুমি দাড়াও।"

ছেলেটি চাবি দেওয়া পুতুলের মত উঠে দাড়াল, তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল তার নিজের শরীরের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আমি তার পাশে বসে আছি হঠাৎ ঝির ঝির করে পানি গড়িয়ে যাবার মত একটা শব্দ শুনতে পেলাম। চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ভয়ে ছেলেটার পেশাব হয়ে গেছে, সেই পেশাব তার কাপড় ভিজিয়ে ঝির ঝির করে পায়ের কাছে জমা হচ্ছে।

ছেলেটাকে কেন হেড স্যার দাঁড়াতে বলেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কী করা হয়েছিল এতদিন পর আমার সেটা মনে নেই। কিন্তু ছেলেটার পরবর্তী জীবন ছিল খুব ভয়াবহ। যতদিন সে স্কুলে ছিল আমরা তাকে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে দেই নি যে সে ক্লাশে ভয়ে পেশাব করে দিয়েছিল ।

ছোট বাচ্চারা মনে হয় বেশ নিষ্ঠুর হয়ে থাকে।

জ্ঞান আহরণ

আমরা যখন ক্লাশ এইটে পড়ি তখন একদিন ঠিক করা হল আমরা শিক্ষা সফরে যাব। শিক্ষা সফর ব্যাপারটি নামেই শিক্ষা সফর, আসলে সেখানে নদীতীরে বসে মহানন্দে পিকনিক করা হয়। আমাদের সঙ্গে থাকেন মোজাহার স্যার এবং মোজাহার স্যার যেখানেই থাকেন সেখানেই আনন্দের বান ডেকে যায়। আমাদের উৎসাহের শেষ নেই কিন্তু একজন মনে করিয়ে দিল যাবার আগে একটা দরখাস্ত লিখে হেড স্যারের অনুমতি নিতে হয়।

হেড স্যারের কাছে কেউ যেতে সাহস পায় না, অনেক ভেবে চিন্তে আমাদের দুইজনকে ভার দেওয়া হল। আমার সাথে যে যাবে সে বলল, "দরখাস্তটা তুই লেখ।"

"আমি? আমি কেন? তুই লেখ–" আমার ভয় হল দরখাস্ত লিখতে গিয়ে কিছু একটা বানান ভুল করে ফেলব আর হেড স্যার বেত মেরে আমার বারটা বাজিয়ে দেবেন। আমার বন্ধু রাজী হল না গাঁই গুঁই করতে লাগল। তাই আমি শেষ পর্যন্ত দরখাস্তটি লিখে ফেললাম । হেড স্যারের কাছে এটা নেয়া হবে তাই দরখাস্তটিতে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়া হয়েছে, ভাষাটাও হল একেবারে এক নম্বুরী। প্রকৃতি থেকে জ্ঞান অর্জন যে কত জরুরী এবং সেটা করতে না পেরে যে আমাদের যে কত বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সেটা দরখাস্তে হা-বিতং করে লেখা হল। এই শিক্ষা সফরে গিয়ে যে আমাদের কত লাভ হবে এবং আমরা যে কি পরিমান জ্ঞান অর্জন করব সেই কথাগুলিও আমি খুব জোর গলায় লিখে দিলাম। দরখাস্তটি পড়ে আমি নিজেই চমৎকৃত হয়ে গেলাম, আমার বন্ধুও দাঁত বের করে হেসে বলল, "ফাষ্ট ক্লাশ দরখাস্ত।"

আমরা দুরু দুরু পায়ে হেড স্যারের ঘরে হাজির হলাম, হেড স্যার ভুরু কুচকে তাকিয়ে একটা বিজলী দিয়ে বললেন, "কি চাই?'

হেড স্যার বিজলী না দিয়ে কথা বলতে পারেন না এবং তার গলার স্বর শুনে আমাদের হাঁটু কাঁপতে থাকে এবং পেটের মাঝে পাক দিতে থাকে। সেই অবস্থায় আমার বন্ধুটি কাঁপা গলায় বলল, "স্যার, একটা দরখাস্ত।"

"কিসের দরখাস্ত ?" হেড স্যার একটা হুংকার দিলেন।

"শিক্ষা সফরের।"

"দেখি দরখাস্ত–" স্যার চোখ পাকিয়ে হাত বাড়ালেন।

আমি দরখাস্তটা বন্ধুর হাতে ধরিয়ে দিলাম। আমার বন্ধু সেটা কাঁপা হাতে হেড স্যারের হাতে তুলে দিল। হেড স্যার দরখাস্ত পড়তে পড়তে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, তারপর হুংকার দিয়ে বললেন, 'জ্ঞান আরোহন?"

বন্ধুটি দুর্বল ভাবে মাথা নাড়ল এবং কিছু বোঝার আগেই হেড স্যার হঠাৎ খপ করে তার কান ধরে ফেললেন। একটা ঝাঁকুনী দিয়ে বললেন, "জ্ঞান আরোহন? জ্ঞান কি একটা কলা গাছ যে সেটা আরোহন করবি? আহরণ বলে যে শব্দ আছে শুনিসনি কখনো?"

বন্ধুটির মুখ প্রথমে ফ্যাকাসে ছাই বর্ণ তারপর বেগুনি সবশেষে ছাইয়ের মাঝে বেগুনি ছোপ ছোপ হয়ে গেল। আমি নিচে মেঝের দিকে তাকালাম, যে কোন মুহূর্তে একটা তরল পদার্থের প্রস্রবন তৈরী হয়ে যাবে বলে মনে হতে থাকে।

হেড স্যার বন্ধুটির কান ধরে নিজের দিকে টেনে এনে বললেন, "নাকি তুই একটা বাঁদর দিনরাত শুধু গাছ পালায় 'আরোহন' করিস তাই জ্ঞান যে আহরণ করতে হয় সেটা কখনো শিখিস নি?'

আমি পা টিপে টিপে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেলাম। ভয় হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে বন্ধুটি আমার দিকে আঙ্গুলী দিয়ে দেখিয়ে বলবে, "স্যার দরখাস্তটা আমি লিখি নাই, এ লিখেছে।" তখন হেড স্যার তাকে ছেড়ে দিয়ে খপ করে আমার চুলের মুঠি খামচে ধরবেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভয়ে আতংকে আমার বন্ধুটি তখন জড় পদার্থের মত হয়ে গেছে, কথা বলা দূরে থাকুক মনে হয় নিঃশ্বাসও নিচ্ছে না। হেড স্যার তার কান ধরে আরো একবার ঘুরিয়ে এনে বললেন, "জ্ঞান কেউ আরোহন করে না, জ্ঞান আহরণ করে, মনে থাকবে?"

কান ধরা থাকায় আমার বন্ধুটি মাথা নাড়তে পারল না, তাই আমি দূরে দাঁড়িয়ে থেকে জোরে জোরে মাথা নাড়লাম। 'আরোহন' আর আহরণ যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আমি কি আর সেটা জানি? জানলে কি কেউ আর এমন ভুল করে?

হেড স্যারের ঘর থেকে বের হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর বন্ধুটি ঘোলা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ফ্যাঁস ফেসে গলায় বলল, "দরখাস্তটা তো তুই লিখেছিলি?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"তাহলে?"

"তাহলে কী?"

"তাহলে আমি মার খেলাম কেন?"

ব্যাখ্যার অতীত কোন একটা জিনিস দেখলে মানুষ যেরকম ভঙ্গি করে আমি সেরকম ভঙ্গী করলাম। আমার বন্ধুটি এবারে একটু রেগে রেগে গিয়ে বলল, "তুই-তুই কিছু বললি না কেন?"

"কী বলব? স্যার প্লীজ আমার কান ধরে একটা ঝাঁকুনি দেন, এটা আমার দোষ?"

বন্ধুটি এক ধরণের শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পৃথিবীতে যে অনেক ধরণের অবিচার হতে পারে মনে হয় সে সেটা বুঝতে শুরু করেছে।

শিক্ষা সফরের দরখাস্তে ভুল থাকার পরও আমরা শিক্ষা সফরের অনুমতি পেয়েছিলাম। সবাই মিলে গিয়েছিলাম একটা নদী তীরে, ভারি মজা হয়েছিল সেদিন।

এর মাঝে একদিন হৈ চৈ করে স্কলারশীপ পরীক্ষা শুরু হল। আমরা কয়েকজন সেই পরীক্ষায় সুযোগ পেয়েছি। নির্দিষ্ট দিনে আমরা খুব গম্ভীর ভাবে পরীক্ষা দিতে রওনা হলাম। প্রত্যেকের পকেটে দুইটা করে কালি ভরা কলম। যারা বাড়াবাড়ি ধার্মিক তাদের মাথায় টুপি এবং সেই টুপিতে হাই পাওয়ায় তাবিজ। পরীক্ষার মাঝে মাথা ঠান্ডা রাখার জন্যে ডাবের পানির ব্যবস্থা। সবাই আমাদের খোঁজ নিচ্ছে, তাই অহংকারে আমাদের একেকজনের মাটিতে পা পড়ছে না।

স্কলারশীপ পরীক্ষা দেবার জন্যে আশেপাশের অঞ্চল থেকে অসংখ্য ছেলেপিলে শহরে এসেছে। রাস্তাঘাটে অসংখ্য তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলে, তাদের দেখলেই বোঝা যায় পড়ুয়া ছেলে, পকেটে কলম এবং প্রশ্নপত্র নিয়ে গম্ভীর মুখে ঘুরোঘুরি করছে।

পরীক্ষার পরের দিন স্কুলে এসেছি, হঠাৎ একজন খবর আনল পরীক্ষা দিতে এসে একজন ছেলে খুন হয়ে গেছে। আমাদের স্কুলের কাছেই তার লাশ ফেলে রেখেছে। আমরা ছুটতে ছুটতে গেলাম লাশ দেখতে, গিয়ে দেখি সত্যিই তাই। দেয়ালের পাশে মাথা বাঁকিয়ে পা ভাঁজ করে আমাদের বয়সী একটা ছেলে পড়ে আছে। দেখে মনে হতে পারে ঘুমিয়ে আছে কিন্তু এক নজর দেখলেই বোঝা যায় এটা ঘুম নয়।

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের আশে পাশে লোকজনের ভিড় জমে উঠছে , তাদের কাছে শুনতে পেলাম পরীক্ষা দিতে এসেছিল, পরীক্ষা শেষ হবার পর রাতে সেকেন্ড শো সিনেমা দেখেছে তারপর বন্ধুরা মিলে খুন করে ফেলেছে।

শৈশব কৈশোরের কত মজার স্মৃতি রয়েছে আমাদের, কিন্তু ঠিক আমাদের বয়সী ছেলেরা যদি একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলতে পারে তাহলে তাদের বুকের মাঝে কি রয়েছে? আমাদের পাশাপাশি কি রয়েছে বিভৎস কালো একটা অন্ধকার জগৎ? আমরা যেটা খোঁজ পাই না? আমরা যখন শৈশবের আনন্দে অবগাহন করছি ঠিক তখন আমাদের বয়সী কিছু ছেলে মেয়েরা ভয়ংকর কালো কুৎসিত জঘন্য নিরানন্দ একটা কষ্টের জীবনে ধুকে ধুকে বেঁচে আছে? পাশাপাশি থেকেও আমরা সেই জগতের খোঁজ পাই না?

সব হিসেব মনে হয় মিলে না কোথাও।

বগুড়া জিলা স্কুলে একটা চমৎকার লাইব্রেরী ছিল। স্কুল থেকে আলাদা, মাঠের পাশে গাছের ছায়ায়, ছোট একটা ঘর। আমাদের যে কয়জনের বই পড়ার সখ ছিল তারা সারাক্ষণ এই লাইব্রেরীতে পড়ে থাকতাম। এই লাইব্রেরীতে এসে আমি আবিষ্কার করলাম চমৎকার সব বিজ্ঞানের বই, সবই ইংরেজী বই, কিন্তু ভিতরে কি অপূর্ব রঙিন সব ছবি। সেই ছবি দেখলে বুকের মাঝে কাঁপুনী শুরু হয়ে যায়। ক্লাশের পাঠ্য বিজ্ঞান বইটি নেহায়েৎ দায় সারা একটা বই তার মাঝে পৃথিবীর রহস্যের কিছুই উল্লেখ নেই, অথচ এই বইগুলি কি চমৎকার। বইগুলি লাইব্রেরী থেকে বাইরে নেয়ার কথা না কিন্তু লাইব্রেরীয়ান ততদিনে আমাকে চিনে গেছে, বইগুলি নিয়ে আমার আগ্রহও এতদিনে টের পেয়ে গেছে, তাই বইগুলি সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবেই আমাকে বাসায় নিতে দিত। বাসায় এনে সেই সব বই পড়ে পড়ে আমার সামনে তখন একটা বিস্ময়কর জগৎ খুলে যেতে শুরু করল। আমি তখন আমার বিজ্ঞান গবেষণা শুরু করলাম।

গবেষণা করার জন্যে প্রথমেই দরকার হচ্ছে একটা ল্যাবরেটরী। সেই ল্যাবরেটরীতে থাকতে হয় নানা ধরণের যন্ত্রপাতি, ক্যামিকেল কিন্তু তার বিশেষ কিছুই আমার নেই। আমার পয়সা কড়িও বেশি নেই।। আর পয়সা কড়ি থাকলেই যে আমি সেসব কিনতে পারব তার কোন গ্যারান্টি নেই। কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না, আমার কাছে যা আছে তাই দিয়েই কাজ শুরু হল।

চেয়ারের নীচে সুতা দিয়ে একটা ঢেলা বেঁধে বাবার নষ্ট হয়ে যাওয়া একটা ঘড়ি (যেটা মাঝে মাঝে চলতে শুরু করে) দিয়ে দোলনের সময় মেপে মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণ বের করলাম একদিন। চুম্বক তৈরী করার জন্যে এক টুকরা লোহা কাটার দরকার, 'হ্যাক স' নেই বলে কাটতে পারি না। তাই ভাবলাম এসিড দিয়ে গলিয়ে ফেলি। ওষুধের দোকান থেকে একটি এক শিশি সালফিউরিক এসিড কিনে আনলাম। আমার মত ছোট বাচ্চাকে সালফিউরিক এসিড বিক্রি করে দিয়েছে বলে দোকানীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না । সেই এসিড দিয়ে লোহার টুকরো গলিয়ে তার উপর তার প্যাচিয়ে চুম্বক তৈরী হল একদিন। বাতাসের দিগ দর্শন যন্ত্র তৈরী করে ছাদে লাগানো হল। টেস্ট টিউবের ভিতর অনেক গুলি ম্যাচের কাঠি ঠেসে একটা রকেট তৈরী হল, পানির থালায় সেটাকে দাড়া করিয়ে রেখে ম্যাগনিফাইং গ্লাশ দিয়ে সূর্যের আলোকে কেন্দ্রীভূত করে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে দেয়া হল। বিকট শব্দ করে সেই রকেট উপরে উঠে গেল সত্যি, কিন্তু যা একট দুর্গন্ধ বের হল সেটি বলার মত নয়। চশমার দোকান থেকে পুরানো লেন্স কিনে এনে টেলিস্কোপ তৈরী হল। বহুদূরের একজন মানুষকে দেখছি কিন্তু সে জানে না তাকে দেখছি– ব্যাপারটার মাঝে এক ধরণের নিষিদ্ধ আনন্দ রয়ে গেছে।

টেলিস্কোপের পর তৈরী হল প্রজেক্টর । বাঁশের নল কেটে তার মাঝে লেন্স লাগানো হয়েছে। বিস্কুটের বাক্সের মাঝে সেটা লাগানো হয়েছে। পিছনে লাইট বাল্ব। ঘর অন্ধকার করে প্রজেক্টর দিয়ে দেয়ালে ছবি দেখানো হল। বিদেশী রঙিন সিনেমার ফিল্মের টুকরো পাওয়া যায়। সেগুলি কেটে কেটে ভিতরে দিয়ে দেওয়ালে সেই সব ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। দেখে শিহরিত হবার মত অবস্থা।

প্রজেক্টর তৈরী হয়েছে খবর পাবার পর বন্ধুবান্ধব সবাই দেখতে এসেছে। যারা খাঁটি বন্ধু তারা মাথা নেড়ে বলল,"সাংঘাতিক জিনিষ!" আর যারা হিংসুটে তারা আমার প্রজেক্টরের খুঁত বের করার চেষ্টা করতে লাগল। বলতে লাগল তারা যখন তৈরী করবে, সেটা হবে এর থেকে একশ গুণ ভাল।

সবাই অবশ্যি জানতে চাইল আমি কেমন করে তৈরী করেছি। খুলে তাদের দেখানো হল, দেখে একজন বন্ধু বলল, "একেবারে ফাষ্ট ক্লাশ জিনিস তৈরী করেছিস। আমাকে দে আমার বাসায় নিয়ে দেখাই।"

"কাকে দেখাবি?"

"আব্বাকে আর আম্মাকে ।"

"সত্যি?"

বন্ধু মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আর আমার বোনকে, কোনদিন এই রকম জিনিস দেখে নাই। একেবারে এক নম্বর জিনিষ।"

আমার বিজ্ঞান গবেষণালব্ধ এই প্রজেক্টরটি বন্ধু তার বাবা মা এবং বোনকে দেখাবে শুনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল। আমি খুব খুশী হয়ে তাকে প্রজেক্টরটি দিলাম।

আমার এই বন্ধুটি সেই প্রজেক্টর নিয়ে সেটা আর কোনদিন ফেরৎ দেয় নাই। আমি যতবার তাকে মনে করিয়ে দিয়েছি ততবার সে বলেছে, "কালকেই নিয়ে আসব।" কিন্তু সেই "কালকে" আর কখনো আসে নি।

বিজ্ঞান আর আবিষ্কারের জগতে যে নানারকম চুরি চামারী হয় সেটা তখনই আমি প্রথমবার জানতে পারালাম।

ব্যাঙ

নানা বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি, সেখানে একটা ছেলের সাথে পরিচয় হল। গ্রামের স্কুলের ছেলে কিন্তু পড়াশোনায় খুব ভাল । তার একটি সমস্যা স্কুলের ল্যাবরেটরী ভাল না, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশগুলি ঠিকভাবে হয় নি। বিশেষ করে ব্যাঙ কাটার একটা প্র্যাকটিক্যাল আছে সেটা কীভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। পরীক্ষায় নির্ঘাত সেটা আসবে তখন সে কী করবে সেটা নিয়ে এখন থেকে দুশ্চিন্তা। শুনে আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম, "তোমার কোন ভয় নেই, আমি তোমাকে ব্যাঙ কাটা শিখিয়ে দেব।"

ছেলেটি আমার থেকে এক ক্লাশ নিচে পড়ে । চোখ কপালে তুলে বলল, "আপনি?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি জানেন ব্যাঙ কাটা?"

আমি সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললাম , "আরে, ব্যাঙ কাটা তো সোজা। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।"

আমি বগুড়া জিলা স্কুলের ছাত্র, সেটা রাজশাহী বোর্ডে। রাজশাহী বোর্ডে তখন প্র্যাকটিকেল নেই কাজেই ব্যাঙ কাটা দূরে থাকুক আমাদের স্কুলে আলু পটলও কাটা হয় না! তবে এই সব খুটিনাটি বলে আমি ছেলেটাকে নিরুৎসাহিত করলাম না। আমি যখন চট্টগ্রামে থাকি আমার এক মামা কলেজে পড়তেন, পরীক্ষার আগে তাকে একবার ব্যাঙ কাটতে দেখেছিলাম, ঘটনাটা আমার মনে আছে। সেটাই আমার ভরসা। আমি কখনোই কোন কিছুতে হাল ছেড়ে দিই না! ছেলেটাকে বললাম, "তুমি একটা টিনের থালা, দুইটা বড় মোমবাতি, এক ডজন আলপিন, একটা নুতন ব্লেড, একটা কৌটা আর দুইটা বড় সাইজের ব্যাঙ নিয়ে এস।"

ছেলেটা পরের দিনই জিনিস পত্র নিয়ে হাজির হল। ব্যাঙ এখনো আনে নি, কারণ বাড়ির কাছেই ডোবা এবং নদী। সেখানে ব্যাঙের হৈ চৈ চিৎকারে কান পাতা যায় না, যখন খুশী ধরে আনা যাবে। আমরা টিনের থালায় মোম গলিয়ে একটা আস্তরণ তৈরী করে ব্যাঙ ধরতে বের হলাম। ব্যাঙকে দেখে তাদের যে রকম বোকাসোকা প্রাণী বলে মনে হয়, ধরতে গিয়ে টের পেলাম আসলে তারা কিন্তু তত বোকা নয়। তারা বেশ চালাক চতুর এবং তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র যে তারা বড় পিছলে। যখন মনে হয় ধরে ফেলেছি ঠিক তখনও হাত গলে পিছলে বের হয়ে যায়। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাঙ ধরে সেটাকে কৌটায় ভরে আনা হল। আমি গম্ভীর হয়ে ব্যাঙটাকে পরীক্ষা করে বললাম, "এখন ব্যাঙটাকে অচেতন করতে হবে।"

"অচেতন?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"ব্যাঙটাকে কাটতে হবে না? জ্যান্ত অবস্থায় তো কাটা যাবে না, কষ্ট পাবে।"

"কিভাবে অচেতন করবেন?"

"ক্লোরোফর্ম দিয়ে করার কথা।"

"ক্লোরোফর্ম?" ছেলেটা চোখ কপালে তুলে বলল, "ক্লোরোফর্ম কোথায় পাব?"

আমি মাথা চুলকালাম, ক্লোরোফর্ম খুব সহজে পাওয়ার কথা নয়। ডিটেকটিভ বইয়ে পড়েছি নাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে শত্রুকে ঘায়েল করা হয়। আমি অবশ্যি হাল ছেড়ে দিলাম না বললাম, "ক্লোরোফর্ম যেহেতু নেই সেটা তৈরী করে নেয়া যাক।"

ছেলেটা অবাক হয়ে বলল, "ক্লোরোফর্ম তৈরী করবেন?"

"ক্লোরোফর্ম তো তৈরী করা যাবে না, কিন্তু ক্লোরোফর্মের মত কাজ করে সেরকম একটা জিনিস তৈরী করা যাক।"

"কিভাবে তৈরী করবেন?"

"খুব সোজা। দুই চামুচ হুকার পানি, তার মাঝে এক চামুচ কেরোসিন, তেল তার মাঝে দুই চিমটে লবণ আর মরিচের গুড়ো, এক চামুচ ডেটল আর এক চিমটে কাপড় ধোয়ার সোডা দিয়ে কৌটাটাতে ব্যাঙটাকে কয়েকবার ঝাকাও।"

ছেলেটা আমার কথামত সবকিছু দিয়ে ব্যাঙটাকে কৌটায় ভরে ভাল করে ঝাকাল,তারপর কৌটা খুলে দেখি সত্যি সত্যি ব্যাঙটা ডিমরী খেয়েছে।

আমি তখন ব্যাঙটাকে থালার মাঝে চিৎ করে শুইয়ে পিন দিয়ে চার হাত পা গেঁথে ফেললাম। তারপর প্লেটের মাঝে খানিকটা পানি ঢেলে নূতন ব্লেড দিয়ে ব্যাঙ কাটা শেখানো শুরু করলাম। বুক থেকে পেট পর্যন্ত চামড়া কেটে সেটা সরিয়ে নিতেই ভিতর থেকে ব্যাঙের পরিপাক যন্ত্র, হৃদপিন্ড, লিভার ফুসফুস বের হয়ে পড়ল। কোনটা কি তাকে দেখিয়ে আমি সবকিছু পানির মত বুঝিয়ে দিলাম।

আমার সেই এক রাতের ছাত্র বায়োলজীতে খুব ভাল করে শেষে ডাক্তারী পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছে। সে যে ভাবে ব্যাঙ কাটা শিখেছিল, সেভাবে রোগী কাটা শিখেছিল কিনা সেটা চিন্তা করে অবশ্য মাঝে মাঝে আমার খুব দুশ্চিন্তা হয়!

শেষ কথা

আমি তখন নিউজার্সীতে বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে কাজ করি। একদিন বাচ্চাদের একটা স্কুল থেকে আমাকে খবর পাঠাল আমি সেখানে বিজ্ঞানের উপর ছোটখাট এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাতে পারব কিনা। আমি সাথহে রাজী হলাম।

রাত জেগে জেগে আমি বাচ্চাদের জন্যে এক্সপেরিমেন্ট দাঁড়া করলাম। কিছু এক্সপেরিমেন্ট হল খুব সহজ ঘরে বসে হাতের কাছের জিনিস দিয়ে করতে পারে, কিছু হল ল্যাবরেটরী এক্সপেরিমেন্ট প্রিজম দিয়ে বর্ণালী, প্রজেক্টর দিয়ে রং মিশ্রন, পোলারাইজার দিয়ে আলো পোলারায়ন, কিছু এক্সপেরিমেন্ট হল অসম্ভব জটিল। আমার ল্যাবরেটরী থেকে ধার করে আনা শক্তিশালী ডাই লেজার দিয়ে বিচিত্র আলোর খেলা!

সব কিছু নিয়ে আমি স্কুলে এসে হাজির হয়েছি। কী চমৎকার একটি স্কুল, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়! ঝকঝকে দেয়াল মেঝে দেখলে শুনে হয় বুঝি শ্বেত পাথরের তৈরী। উঁচু ছাদ উজ্জল রং দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়। সুন্দর সুন্দর ক্লাশ ঘরে বাচ্চারা ক্লাশ করছে। সেখানে বাচ্চাদের উপযোগী ছোট ছোট ডেস্ক, ক্লাশ ঘরে পড়াশোনায় সাহায্য করার নানারকম জিনিস, ম্যাপ গ্লোব নক্সা ছবি কাগজ কলম বই, এমন কি হাত ধোয়ার জন্যে ছোট ছোট বেসিন! কারো ক্লাশে একুয়ারিয়ামে গোল্ড ফিস, কারো ক্লাশে খরগোসের বাচ্চা, কারো ক্লাশে ছোট ছোট গিনিপিগ । দেয়ালে একটু পরে পরে পানি খাবার জায়গা। ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা আলাদা বাথরুম। স্কুলের একপাশে ব্যস্ত অফিস, অফিসের পাশে বিশাল লাইব্রেরী, লাইব্রেরীর পাশে কম্পিউটার ঘর– সেখানে সারি সারি কম্পিউটার। জিমনাসিয়ামে বাচ্চারা খেলছে, মিউজিক রুমে গান শিখছে। ছবি আঁকার আলাদা ঘর সেখানে ছোট ছোট এপ্রন পরে বাচ্চারা ছবি আঁকছে। স্কুলের এক পাশে নার্সের ঘর, যে ছোট বাচ্চাটি খেলতে গিয়ে হাটুর ছাল তুলে ফেলেছে, সেখানে ওষুধ লাগাচ্ছে একজন নার্স। গুরুতর কিছু নয়, তাহলে ফোন করে দিত বাসায়।

আমাকে নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, দরজা খুলতেই একদল বাচ্চা ছেলে মেয়ে সুর করে বলল, গু-ড-ম-র্নি-ং-মি-স্টা-র-ই-ক-বা-ল।

আমিও মাথা নেড়ে তাদের প্রত্যুত্তর দিলাম। ক্লাশের শিক্ষয়ত্রী আমাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলেন। সোনালী চুলের হাসিখুশী একজন কম বয়সী মেয়ে। স্কুলে শিক্ষকদের হাসিখুশী হতেই হবে, মুখ গোমড়া করে রাখলে সে কেন স্কুলে পড়াতে আসবে? সব শিক্ষকদের বাচ্চাদের পড়ানোর আগে বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয়, দেখে বোঝা যায় না। কিন্তু এই কম বয়সী মেয়েটিও ভীষণ শক্ত, দুষ্টু হোক আর শিষ্ট হোক সব বাচ্চাকে সে সামলাতে পারে যে কোন অবস্থায়। পড়াশোনায় কোন ফাঁকি নেই, যাকে যেটুকু সময় দেয়া দরকার তাকে

ঠিক ততটুকু সময় দিচ্ছে। কেউ যদি বাড়াবাড়ি দুষ্টু হয় তাহলে তার জন্যে যে রকম বেশী সময় দিতে হয় ঠিক সে রকম কেউ যদি বাড়াবাড়ি বুদ্ধিমান হয় সে যেন তার প্রয়োজনীয় বাড়তি সুযোগটুকু পায় সেখানেও তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়।

আমাকে একটা টেবিল ছেড়ে দেয়া হল, আমি সেখানে আমার এক্সপেরিমেন্টগুলি দাঁড় করলাম। সবাই আমার সামনে গোল হয়ে বসে পড়ল মেঝেতে– আমি তখন শুরু করে দিলাম। বাচ্চাগুলির সে কী আনন্দ। কখনো অবাক, কখনো ভয় আবার কখনো হেসে কুটি কুটি। পৃথিবীতে ছোট বাচ্চার বিস্ময়াভিভূত মুখ থেকে সুন্দর আর কী হতে পারে। বিশেষ করে এদেশে– যেখানে পৃথিবীর সব এলাকা থেকে শিশুরা এসেছে–হঠাৎ করে যখন চোখের সামনে দেখা যায় জাতি ধর্ম সংস্কৃতি ভাষা সব আসলে বাইরের ব্যাপার, ভিতরের ব্যাপার একটিই, সবাই ঠিক একই রকম মানুষ, একই রকম শিশু।

আমি যখন ফিরে আসছি তখন দেখতে পেলাম বাচ্চারা লাইন ধরে কাফেটারিয়াতে খেতে যাচ্ছে। ঝকঝকে একটা কাফেটারিয়াতে বসে নিশ্চয়ই দুষ্টুমী করতে করতে তারা দুপুরের খাবার খাবে, অনেক ভাবনা চিন্তা করে সেই খাবার তৈরী হয়েছে। খাবার পর বাইরে গিয়ে খানিকক্ষন ছোটাছুটি করে আবার ক্লাশে ফিরে আসবে। কোন কোন ক্লাশ হয়তো মিউজিয়ামে যাবে বাসে করে, কোন ক্লাশ যাবে চিড়িয়াখানায়, কোন ক্লাশ হয়তো যাবে থিয়েটারে।

আরো যখন বিকেল হবে তখন স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। স্কুলের বাসে করে সবাইকে নিয়ে যাবে বাসায়, একেবারে ঘরের দোরে পৌছে দেবে হলুদ রংয়ের স্কুল বাস। যখন বাচ্চাদের জন্য বাস থামে তখন বাসের উপর লাল বাতি জ্বলতে থাকে, সব গাড়ি তখন থেমে যায় দুপাশে। বাচ্চারা হঠাৎ যদি দৌড় দেয় রাস্তা দিয়ে, একসিডেন্ট হতে পারে তাই এরকম সাবধান।

এরকম চমৎকার একটা স্কুলে পড়ে ছোট একটা মেয়ে, তাকে আমি চিনি। একদিন আমাকে বলল, "তুমি যখন ছোট ছিলে তখন যে স্কুলে যেতে তার গল্প শোনাবে আমাকে?"

আমি তাকে গল্প শোনালাম কচুপাতার গল্প, বিস্কুটের মালার গল্প, সাপ ধরার গল্প, ড্রয়িং মাস্টারের গল্প, কোকাকোলা আর বল পয়েন্ট কলমের গল্প, ব্যাঙের ছাতা আর হেঁচকির গল্প, বিহারী মেয়ে আর কালাপাহাড়ের গল্প। পাগল স্যারের গল্প। রকেটের গল্প।

গল্প শুনে ছোট মেয়েটির চোখ কেমন জানি বিষন্ন হয়ে উঠে। আমার দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,"ইশ! কী মজাই না হতো তোমাদের স্কুলে! আমি যদি কোথাও পেতাম তোমাদের মত একটা স্কুল!"